দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ওয়াকফ সংশোধনী বিল
জাতীয় স্বার্থরক্ষায় এক
যুগান্তকারী উদ্যোগ
— পৃঃ ১৩

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কি
আন্তর্জাতিক স্তরে?
— পৃঃ ১৫

৭৭ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪।। ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৯ ডিসেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-র নগ্ন খেলায় মেতে রাজ্যের ত্রিকোণ চক্র, নির্লজ্জ নীরবতা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ভাইপোটার জন্য বড্ডো কষ্ট গো দিদি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

জাতীয় পতাকার অসম্মানের নাম করে সাধুসন্তদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা □ ৮

দেশে বর্তমানে জারি থাকা ওয়াকফ আইনের সংশোধন কেন প্রয়োজন ? □ বিশ্বামিত্র □ ১০

গুলশন কলোনি : আর কত মিনি পাকিস্তানের হদিশ মিলবে ? □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১১

ওয়াকফ সংশোধনী বিল জাতীয় স্বার্থরক্ষায় এক যুগান্তকারী উদ্যোগ □ ধর্মানন্দ দেব □ ১৩

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কি আন্তর্জাতিক স্তরে ? □ বিমলশঙ্কর নন্দ □ ১৫

ওয়াকফ বোর্ডের ইতিকথা □ ভাস্কর ভট্টাচার্য □ ১৮

বিচারবিভাগীয় অতিসক্রিয়তা : নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অধিকার খর্ব করা নয় কি ? □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১৯

ভারতধর্ম : আত্মমুক্তি নয়—জগৎ কল্যাণ □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

সাক্ষাৎকার : বিচারবিভাগ হোক বা প্রশাসন, দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও আপোশহীন হলে প্রতিটি আইনের প্রকৃত প্রয়োগ সম্ভব--- শ্রীঅভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় □ ৩৫

ভারতীয় সংবিধানের মূলে কুঠারাঘাতকারী ওয়াকফ আইনের সংশোধন আশু কর্তব্য □ দেবজিৎ সরকার □ ৪৩

ওয়াকফ বোর্ড—ভারতের মধ্যে আর একটি পাকিস্তান তৈরির কংগ্রেসি ষড়যন্ত্র □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ৪৫

অবশেষে খোলসা হলো ইউনুস পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মূল রহস্য □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

□ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ □ খেলা : ৩৮ □ রঙ্গম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সবার মা

প্রকৃত মা। পাতানো মা নয়। সত্যিকারের মা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রী মা সারদা। মাতৃত্বের চরম আদর্শ। পবিত্র মা।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁর কয়েকজন ভক্ত।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০/- + ৩৬০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০/- + ৮৫০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রণয়ন আবশ্যক

এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে একবার দেশের বিভাজন ঘটিয়াছে। বিভক্ত ভারতে পুনরায় তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তাহার সহিত তাহাদের হস্তগত হইয়াছে বিপুল পরিমাণে জমি। সেই জমি দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন। নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে ওই বিশেষ সম্প্রদায় পরিচালিত ওয়াকফ বোর্ডের হাতে। ১৯২৩ সালে বিভেদকামী ব্রিটিশ শক্তি এই বোর্ড নির্মাণ করিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পর সেই বোর্ডের কোনো কার্যকারিতা ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস সরকার ১৯৫৪ সালে তাহাদের ভোটব্যাংক সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত রাখিবার লোভে ওয়াকফ বোর্ডকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সংসদে ওয়াকফ আইন পাশ করিয়া লয়। আইনে পরিণত হইলেও তখন ওয়াকফ বোর্ডের হাতে অদ্যকার ন্যায় ক্ষমতা ছিল না। ১৯৯৫ সালে কংগ্রেস সরকার সেই আইন সংশোধন করিয়া ওয়াকফ বোর্ডেকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করিয়া বসে। তখন হইতে তাহারা নানাবিধ কৌশলে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ২০১৩ সালে সেই আইনে পুনরায় কিছু সংশোধন করিয়া তাহাদের ক্ষমতা আরও বর্ধিত করিয়া দেয়। অবাক করিবার মতো বিষয় হইল, বর্তমানে ওয়াকফ বোর্ডের অধিকারে রহিয়াছে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি। ইহা ব্যতীত সাড়ে ৮ লক্ষ বাড়িঘর ও সৌধও তাহাদের অধিকারে রহিয়াছে। সর্বসমেত তাহা দেড়লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ। আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল, ওয়াকফ বোর্ড অধিকৃত আইন বলে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদের উপর সরকারের কোনোপ্রকার কর আদায় করিবার অধিকার নাই। তাহাদের উপর রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারেরও কোনোপ্রকার নিয়ন্ত্রণ নাই। তাহার ফলে তাহারা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে শুরু করিয়া সরকারি জমি, মঠ-মন্দিরের জমি, এমনকী গুরুদ্বারার জমি পর্যন্ত নির্বিবাদে দখল করিয়া চলিয়াছে। ওয়াকফ আইনের বলে তাহার বিরুদ্ধে আইন আদালত করিবার অধিকার কাহারও নাই। ভোটব্যাংক সুরক্ষিত রাখিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ইহা এক তোষণনীতি। দেশের বিভিন্ন রাজ্য হইতে জোর করিয়া জমি দখল কিংবা ওয়াকফ সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ উঠিলেও সরকারের কিছু করিবার নাই। এই অন্যায় অবিচারের কারণে ওয়াকফ আইন সংশোধনের জন্য দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে গত দুই বৎসরে ১২০টি পিটিশন জমা পড়িয়াছে। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, ইহার মধ্যে ১৫টি পিটিশন দায়ের করিয়াছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। ইহা প্রমাণিত সত্য যে, ওয়াকফ বোর্ড শুধুমাত্র হিন্দুদের নহে, বহু দরিদ্র মুসলমানেরও জমি দখল করিয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করিয়াছে। আর তাহাতেই দেশের ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি মায়াকান্না শুরু করিয়াছে। তাহাদের অপপ্রচার, ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করিবার মনস্থ করিয়াছে মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিষ্কার উত্তর, ওয়াকফ আইনের যাহাতে কোনোরূপ অপব্যবহার না হয় তাহার জন্যই সংশোধনী বিল সংসদের পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি অপপ্রচারে মাতিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তাহাদের সংখ্যালঘু সেলকে কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশের নির্দেশ পর্যন্ত দিয়াছে।

দেশের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জানিবার কথা যে, বিশ্বের কোথাও কোনো ধর্মীয় বোর্ড নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নহে। কোনো ইসলামি দেশেও ইহার নজির নাই। ভারতীয় সংবিধানের কোথাও ওয়াকফ আইনের কথা সংবিধান প্রণেতাগণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কংগ্রেস সরকার ইহার আইনি রূপ প্রদান করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, সংশোধনী বিলের মাধ্যমে তাহারা সংবিধানকেই স্বীকৃতি দিতে চাহিতেছে। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, ওয়াকফ বোর্ডের কিছু ক্ষমতা জেলার কালেক্টরের হাতে থাকিবে। জমির মালিকই শুধুমাত্র কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে নথিভুক্ত করিতে পারিবে। কোনো সরকারি জমিকে ওয়াকফ সম্পত্তিতে হিসাবে ঘোষণা করা যাইবে না। ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্ত করিতে হইবে। কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ হিসাবে নথিভুক্ত করিবার অন্তত নব্বই দিন পূর্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে ইত্যাদি। ইহাতে প্রতিপক্ষ দলগুলি বিতর্ক শুরু করায় কেন্দ্রীয় সরকার সংসদীয় কমিটি গঠন করিয়া আলোচনায় রাজি হয়। আলোচনার টেবিলে প্রতিপক্ষ দলের সদস্যদের যুক্তিহীন বিতর্ক ও গুন্ডাগিরির কারণে ঐকমত্য না হওয়ায় সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিবার সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে সংসদের এই শীতকালীন অধিবেশনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করিবার আর কোনো সুযোগ রহিল না। বস্তুত, প্রতিপক্ষ দলগুলির তোষণনীতির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ স্থগিত হইয়া পড়িল। অদূর ভবিষ্যতে ইহার মাশুল যে সমগ্র দেশবাসীকে দিতে হইবে, তাহা একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে ।

সুভাষিতম্

মূর্খাঃ যত্র ন পূজ্যন্তে ধান্যং যত্র সুসঞ্চিতম্।
দাম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতা।। (চাণক্যনীতি)

যেখানে মূর্খদের সম্মান করা হয় না, ধনসম্পদ সঞ্চিত রাখা হয় এবং যেখানে দাম্পত্য কলহ থাকে না, সেখানে মা লক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হন।

‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’-র নগ্ন খেলায় মেতে রাজ্যের ত্রিকোণ চক্র

নির্লজ্জ নীরবতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটি বিদেশি আমদানি। যেমন ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ বা ‘আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না’ সবাই জানেন। কথাগুলি বাংলাদেশে ইসলামি মোল্লাবাদের উত্থান ঘিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর স্যাঙাতদ্বয় সিপিএম-কংগ্রেসের নগ্ন খেলার জন্য প্রযোজ্য। ত্রিকোণ চক্রের চিরশত্রু আর বন্ধু হলো সত্য ভাষণ আর সত্য গোপন। বাংলাদেশে ‘হিন্দু নিধন আর হিন্দু জাগরণ’ তাদের মিত্র আর শত্রু। তারা ছলচাতুরি করে দু’টি শব্দের ভিন্ন বিরোধিতা করে। পাঁচ মাস ধরে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণ ইসলামি মোল্লাবাদের নগ্ন চেহারা। তার সঙ্গে প্রকাশ্যে এসেছে ত্রিকোণ চক্রের নগ্ন হিন্দু বিরোধিতা আর সুবিধাবাদ। খসে পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সম্প্রীতির মেকি মোড়ক। মুসলমান ভোট বালাই!

তাই মোল্লাবাদের ভয়াবহতম রূপকে তারা গ্রাহ্য করতে নিমরাজি। তাদের ধারণা হিন্দু নিধন আটকানোর দায় শুধুমাত্র বিজেপির। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিন্দু হৃদয় সম্রাট। তাই বাংলাদেশ বা ভারতে হিন্দুদের রক্ষার দায় কেবল বিজেপির। আর সবধরনের মুসলমানকে রক্ষার কপিরাইট মমতার। ইদের নমাজে তা তিনি ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস তার নির্বাচনী ইস্তাহার বানিয়েছিল মুসলিম লিগের আদলে।

প্যালেস্টাইনের হামাসের জন্য বামেদের প্রাণ কাঁদে। তাই মূর্খের মতো বাংলাদেশের জেহাদি আন্দোলনকে তারা হিন্দু জাগরণের সঙ্গে তুলনা করে। কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিত উৎখাত হলে তারা ‘রমণ (উল্লাস)’ করে অথচ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য ‘মরণপণ’ করে। এই ত্রিকোণ চক্রের উদ্দেশ্য— মুসলমান ভোটের ক্ষীর ভক্ষণ। নিজেদের সন্তানসন্ততি পালন। নিম্নরুচির এই ভাবনা রাজনৈতিক রক্তাল্পতা আর মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাবের পরিণাম।

মমতা নজরুল তীর্থ বানিয়েছেন। তবে বিদ্রোহী কবির ভাবনাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মমতার ভরা রাজনৈতিক সংসারে বাম-কংগ্রেস নতুন সদস্য। সেখানে মুসলমান তুষ্টীকরণের বিরুদ্ধে হিন্দু আগ্রাসন তত্ত্ব আমদানি করেছেন। মনের মাধুরি মিশিয়ে। নরেন্দ্র মোদী আর বিজেপির একক জোরে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ‘হিন্দু’ শব্দটি জগৎসভায় অনন্য মাত্রা পায়। বিশ্বজুড়ে তা শুদ্ধ ভারতীয়ত্বের মর্যাদা পেয়েছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি চালিত এনডিএ সরকার তৈরি হলে কলকাতার একটি দৈনিকে হেডলাইন হয়েছিল ‘দিল্লিতে রাম রাজত্ব’। ক্ষমতায় এসে মোদী তাকে যথার্থ করেছেন। দিশেহারা মোদী বিরোধী জোট ‘হিন্দু’ শব্দটির প্রতিশব্দ তৈরি করেছে ‘বিষদাঁত’। তাতে পলি জমে উঠে এসেছে এমন কিছু কথা যার সঙ্গে হিন্দু বা হিন্দুত্বের বিরোধ নেই— মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, ব্যক্তিগত অধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর মোল্লাবাদ বিরোধিতা। হিন্দু বা হিন্দুত্ব শব্দটির ব্যাপক রূপকে বিকৃত করেছে এই ত্রিকোণ ষড়যন্ত্রীরা।

বামেদের কাছে মজহব আফিম নয়, ভোটের অস্ত্র। বিজেপির সংস্কৃতায়নের সঙ্গে কংগ্রেস আর বামেদের সাংস্কৃতিক ভাবনার তফাতের মাঝখানে রয়েছে নীতিহীন তৃণমূল কংগ্রেস।

তাই বাংলাদেশে ঘটে চলা মনুষ্যত্বের অবমাননা আর লজ্জার বিরোধিতা করতে তারা স্বাভাবিকভাবেই পিছপা। বিজেপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করলে জাতীয় ভোটে পুরুষোত্তম রামের জন্মভূমি অযোধ্যায় হারত না। ‘শ্রীরাম’ পুরুষোত্তম। ভোটের বোড়ে নয়। ভারত ভূমি যে শ্রীরামভূমি, বিজেপি তার সংস্কৃতীকরণ করে। এই জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতীকরণ বিজেপির পৃষ্ঠভূমি। ত্রিকোণ চক্র ধর্মকে আক্রমণ করে আর জেহাদি তোষণ করে ভোট লড়ে। বামেদের কাছে মজহব আফিম নয়, ভোটের অস্ত্র। বিজেপির সংস্কৃতায়নের সঙ্গে কংগ্রেস আর বামেদের সাংস্কৃতিক ভাবনার তফাতের মাঝখানে রয়েছে নীতিহীন তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল তাৎক্ষণিক দল। এর স্থায়িত্ব নেই, যেমন ছিল না জয়ললিতা বা মায়াবতীর দলের মধ্যে।

ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিলেন। এটা লজ্জার যে সেই বাংলাদেশের ধ্বংস আটকাতে ইন্দিরার নাতি রাহুল প্রায় নীরব। সে দেশে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর প্রস্তাব পর্যন্ত দেননি। তাতে বাম-মমতা শামিল হবে কিনা জানি না। মুসলমান তুষ্টীকরণের মোল্লাবাদী ব্যাখ্যাকেও তারা ভোটের অঙ্কেই মাপে। তাই ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মোল্লাবাদী অত্যাচারের সাফাই দিতে তারা যে পিছপা হবে না সেটাই স্বাভাবিক। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের জন্য তা যে কত লজ্জার! সে লজ্জা লুকোবো কোথায়? চিন্তাবিদ ইপি থম্পসনের মতে ‘প্রোটেস্ট অ্যান্ড সারভাইভ’। আজ ঘরে- বাইরে হিন্দুদের তাই করতে হবে। □

ভাইপোটার জন্য বড্ডো কষ্ট গো দিদি

একমেবদ্বিতীয়মেষু দিদি,

আপনি, আপনি এবং আপনি। আপনি মানেই তৃণমূল। দলের যাবতীয় দুর্নীতি বাদ দিয়ে সবটাই আপনি। অনেকে খারাপ কিন্তু আপনার দলবল মানে কাছের লোকেরা ভালো। হাতে হাতে টাকা নিচ্ছে দেখলেও ভালো। জেল খেটে এলেও। এই যে আপনি বিষয়টা জলের মতো করে প্রতিদিন বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাতে ভাইয়েরা আপ্লুত। ভাই হিসাবে আমিও। কিন্তু দিদি, এটা জেনে রাগ করবেন না প্লিজ যে মাঝে মাঝে ভাইপোটার জন্য বড্ড কষ্ট হয়। গোপন না করেই বললাম। তা বলে ভাববেন না আমি আপনার মতো দিদিকে ছেড়ে ভাইপোকে সেনাপতি বলতে শুরু করব।

ক'দিন আগেই ভাইপো বলেছিলেন, তিনি 'আমি' নয়, 'আমরা'য় বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন 'টিমওয়ার্কে'। তার ঠিক পরেই আপনি বলেছেন, তৃণমূলে শেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন! আপনার এই নির্ঘোষ অবশ্য একটি ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের অঙ্গ, যা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তৃণমূলের অন্দরে চলছে। প্রথমে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দলের 'নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব' নিজের হাতে নেওয়া, জাতীয় কর্মসমিতিতে 'প্রবীণ' নেতাদের অন্তর্ভুক্তি, ভাইপো 'দিল্লির মুখপাত্র' কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরে টানাপড়েন, দিল্লিতে সংসদীয় বৈঠকে সংসদের অন্দরে তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে ভাইপোর নির্দেশ এবং অতঃপর আপনার বক্তব্য যে, সংসদীয় দলের অবস্থান কোনো 'ব্যক্তিবিশেষ' ঠিক করবেন না, ঠিক করবে সংসদীয় দল। সেই দলের সদস্যদের নামও স্থির করে দেন আপনিই। সাংসদ না হলেও আপনি বলেছেন, 'আমিই সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন!'

সম্প্রতি এক বৈঠকে বিধায়কদের 'শৃঙ্খলাপরায়ণ' হওয়ার কথাও বলেন। হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়ে দেন, পর পর তিন দিন বিধানসভায় সময়মতো না-এলে চতুর্থ দিনে সেই বিধায়ককে 'শো-কজ' করা হবে। প্রকাশ্যে ভাইপোকে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রী করতে বলে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পড়েছেন। তাঁকে শো-কজও করা হয়েছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে তার জবাবও দিয়েছেন। সেই আবহেই বিধায়কদের আরও একবার শৃঙ্খলার পাঠ দিয়ে আপনি বলেছেন, দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। ঠারে ঠোরে আপনি যে ভাইপো এবং তাঁর অনুগামীদের বুঝিয়েছেন তা আমি বুঝি দিদি। আপনাকে তো আমি খুব চিনি দিদি।

বিধায়কদের বৈঠকে যে বিষয়টি আমার নজর কেড়েছে, তা হলো অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে নিজের 'সীমানা' চিনিয়ে দেওয়া। নারায়ণকে আপনি নিজের বিধানসভা এলাকার মধ্যে থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। দলের অন্দরে নারায়ণ 'ভাইপো-ঘনিষ্ঠ' হিসেবেই পরিচিত। নারায়ণের কী সাহস দিদি! সে কি না বলে বসেছে, 'রাজনীতি চিরকাল এক জায়গায় থাকে না। আজ যে রাজাধিরাজ, কাল সে ভিক্ষা চায়। তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। (স্বরূপনগরের এক নেতার উল্লেখ করে) আপনি হতে পারেন অনেক বড়ো জায়গায়। মাসখানেক কিন্তু। আর এক মাস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছে। বহু হনুমান-জাম্বুবানের ল্যাজ কাটা যাবে। এই ল্যাজকাটা বাঁদরের দল দেখবেন ঘুরবে।' নারায়ণের ওই বক্তব্য আপনি যে 'সুনজরে' দেখবেন না আমি জানতাম। ল্যাজ কাটার কথা বলায় তাঁরই ডানা ছাঁটা গিয়েছে।

> ভাইপো রাজ্য পরিক্রমায় যাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন 'দরকার নেই।' তাহলে? আবার কি তিনি আমেরিকা বা দুবাই চলে যাবেন? নাকি শ্বশুরবাড়ির দেশে?

আবার দিল্লিতে দলীয় সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন ভাইপো। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তৃণমূলের কেউ 'ব্যক্তিগত' উদ্যোগে যেন সংসদে কোনও বিষয়ে মুলতুবি প্রস্তাব না আনেন। পাশাপাশিই তিনি ওই বৈঠকে সংসদে তোলার জন্য 'মানুষের সঙ্গে জড়িত' বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছিলেন। সাংসদদের প্রতি তাঁর কিছু নির্দেশও ছিল। এর পরেই আপনি বলেন, 'পার্লামেন্টে স্ট্যান্ডটা আমাদের কারও ইন্ডিভিজুয়্যাল ম্যাটার নয়।' অর্থাৎ, সংসদে অবস্থান কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিষয় নয়।

এসবের পরে ভাইপো কী চাপে বলুন তো! ভাইপো আই-প্যাক সংস্থার মাধ্যমেই দল নিয়ন্ত্রণ করেন। আপনি এখন বলে দিয়েছেন কেউ দলে 'প্যাক প্যাক' করতে পারবে না। এই অবস্থায় ছেলেটার টেনশন বুঝছেন। রাজ্য পরিক্রমায় যাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন 'দরকার নেই।' তাহলে? আবার কি তিনি আমেরিকা বা দুবাই চলে যাবেন? নাকি শ্বশুরবাড়ির দেশে? কতবার ডাক্তার দেখানোর নাম করে বিদেশে বসে থাকা যায় বলুন তো! □

জাতীয় পতাকার অসম্মানের নাম করে সাধুসন্তদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বর্তমান প্রধান মুখ চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে বানোয়াট দেশদ্রোহ মামলা সাজিয়ে গ্রেপ্তার করে এবং বশংবদ আদালতে জামিন মঞ্জুর না করে কারাগারে পাঠানোয় প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে হিন্দুরা। ঢাকা, চট্টগ্রাম-সহ দেশের প্রায় সব ক'টি শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। প্রতিবাদ হয়েছে। মোল্লাবাদীদের হাতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশে কোনো সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের, গ্রেপ্তার এবং আদালতে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা গত ৫৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম।

বাংলাদেশে দেশদ্রোহ মামলা দায়েরের একটি পদ্ধতি আছে। আইনজীবীরা জানালেন, দেশদ্রোহ মামলা দায়ের করতে পারে সরকার, তাও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দানের পর। গত ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামের চান্দগাঁও মোহরা ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগে মামলা করেন। পরে অবশ্য ফিরোজ খানকে বিএনপি দল থেকে বহিষ্কার করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিএনপি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। আশ্চর্যের বিষয় আদালতে এই মামলা গ্রহণ করেছে, বাতিল করেনি।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন অজয় দত্ত, লীলারাজ দাস ব্রহ্মচারী, গোপাল দাস, কথক দাস, প্রকৌশলী অমিত ধর, রনি দাস, রাজীব দাস, কৃষ্ণ কুমার দত্ত, জিকু চৌধুরী, নিউটন দে, তুষার চক্রবর্তী, মিথুন দে, রূপন ধর, রিমন দত্ত, সুকান্ত দাস, বিশ্বজিৎ গুপ্ত, রাজেশ চৌধুরী, হৃদয় দাস।

অহেতুক একটা হিংসার পরিস্থিতি তৈরি করেছে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মুহম্মদ ইউনুসের তদারকি সরকার। চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে যে দেশদ্রোহ মামলা সাজানো হয়েছে তা একেবারেই হাস্যকর। মামলার এজাহারে বাদী অভিযোগ করেন, 'গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট মোড়ের জিরো পয়েন্টে স্তম্ভের ওপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা একটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে, যা এখনো সেখানে রয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে লালদীঘির মাঠে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ ওই সমাবেশে যোগ দেন। ওই দিন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী-সহ ১৯ জনের ইন্ধনে বাকিরা নিউমার্কেট মোড়ের জিরো পয়েন্ট স্তম্ভ এবং আশপাশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপর ইসকনের গেরুয়া রঙের ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করে সেখানে স্থাপন করে দেন। এ নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।'

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপরে অন্য পতাকা। এটা দেশদ্রোহ নয়?

বিষয়টি মোটেই সত্য নয়। সেই জিরো পয়েন্টের যে ছবি হাতে এসেছে তাতে দেখা যায়, জাতীয় পতাকা থেকে দূরে সেই গেরুয়া রঙের ধর্মীয় পতাকা স্থাপিত হয়েছে। আসলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গত ৫ আগস্টের পর থেকে ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও হামলার প্রতিবাদ আন্দোলনে চিন্ময়কৃষ্ণ ক্রমেই প্রধান মুখ হয়ে উঠছেন, নির্ভয়ে সত্যগুলো তুলে ধরছেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাধুসন্তদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরেছেন— এটাই সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে ও রংপুরে মহাসমাবেশ সরকারের কপালে ভাঁজ ফেলে দেয়। কারণ পুলিশ সমাবেশ আটকানোর চেষ্টা করেও পারেনি। বাংলাদেশ সনাতনী জাগরণ জোটের দুই সমাবেশে এতো লোকসমাগম হয়েছে, যা দুই বড়ো দল আওয়ামি লিগ বা বিএনপিকেও হতবাক করেছে। চট্টগ্রামের সমাবেশ অন্তত চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রংপুরে প্রশাসন শহরে সমাবেশ করতে দেয়নি। শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে একটি স্কুল মাঠে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের ভাষায় এই সমাবেশে আশেপাশের জেলা থেকেও হিন্দুরা ছুটে আসে এবং লক্ষ লোকের সমাবেশে পরিণত হয়। সমাবেশ পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমাবেশে যোগদানের জন্য চিন্ময় প্রভুর নেতৃত্বে সাধুসন্তরা রংপুর শহরে এসে পূর্ব নির্ধারিত হোটেলে উঠেছিলেন। পরে

পুলিশের নির্দেশে তাঁদের হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে গেলে তিনি দেখা করেননি। পরের দিন সমাবেশে যাওয়ার পথে হামলা চালানো হয়। হামলায় কয়েকজন আহত হন।

এছাড়া আন্দোলনের পর্যায়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে। গত ৫ আগস্ট জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর হিন্দুদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন এবং মঠ-মন্দিরে হামলার বিচারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল 'সনাতন জাগরণ মঞ্চ'। ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ এবং বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট মিলে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জোটের মুখপাত্র হন চিন্ময় প্রভু। তাঁর বক্তব্য নির্যাতিত হিন্দুদের মনের কথাগুলো উঠে আসছিল। অত্যন্ত সুন্দর করে, অত্যন্ত সুললিত উচ্চারণে তিনি ভাষণ দেন। ২২ নভেম্বর রংপুরে বিভাগীয় সমাবেশে কী বলেছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ প্রাণ বলিদানের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হলো হিন্দু। এ সময় ১ কোটি শরণার্থীর মধ্যে ৭০ শতাংশ ছিল হিন্দু, যাদের বাড়িঘরে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে। গত ৫ আগস্টের পর হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলার অভিযোগ করে তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তনের তিন মাস পরও দৃশ্যত কোনো পরিবর্তন নেই। এখনো কিছু জায়গায় হিন্দু বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চলছে। এখনো চাঁদাবাজি ও চাকরিচ্যুতি চলছে। এর অর্থ হলো উগ্রবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকার ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একটি অংশ সম্মিলিতভাবে সনাতনী সংখ্যালঘুদের এদেশ থেকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, সনাতনীদের আওয়ামি লিগ, বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টির তকমা দিয়ে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এখন ঐক্যের সুবাতাস বইছে। এখন আমাদের কেউ বিভক্ত করতে চাইলে আমরা তাকে ছুঁড়ে ফেলব। বিভক্তকারীকে কোনো স্থান দেওয়া হবে না। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের সমাবেশস্থল জিলা স্কুল মাঠ থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। পুলিশ সুপারের নির্দেশে হোটেল ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। সৈয়দপুর, জলঢাকা, দিনাজপুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত শত শত বাস পথে আটকে রাখা হয়েছে। সনাতনী মহাসমাবেশে যোগ দেওয়ার কারণে হামলার শিকার হয়েছেন দুই-তিনজন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মূল কথা ছিল বৈষম্য নিরসন। কিন্তু অভ্যুত্থানের তিন মাস পার হলেও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন চলছেই। এটা গণঅভ্যুত্থানে আত্মাহুতিদানকারীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি। সাম্য ও সমতায় বিশ্বাসী হলে দেশের সব নাগরিকের সুরক্ষায় পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। বাক্‌স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সহাবস্থান চায় সংখ্যালঘুরা। হতে চায় রাষ্ট্র নির্মাণের সহযোগী।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপর বসে নমাজ পড়ছে দুই মোল্লাবাদী। এটাও তো দেশদ্রোহ।

চট্টগ্রামের সমাবেশেও প্রায় একই কথা তিনি বলেন। তিনি একটি কথা সবসময় উচ্চারণ করেন, ধর্মনির্বিশেষে সব মানুষ যেন একটি পরিবারের মতো বাঁচতে পারে তার জন্যেই এই আন্দোলন। একই কথাতো বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুস। তাহলে চিন্ময়কৃষ্ণ বলাতে অপরাধ কেন? জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গেয়ে প্রত্যেক সমাবেশ শুরু হয়। তা সত্ত্বেও চিন্ময় প্রভু ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেই দায়ের হলো দেশদ্রোহ মামলা।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন শঙ্কর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ তপনানন্দ গিরি মহারাজ, ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌর দাস ব্রহ্মচারী, চট্টগ্রামের ঋষিধামের মোহন্ত সচ্চিদানন্দ পুরী মহারাজ, কৈবল্যধামের মহারাজ কালীপদ ভট্টাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও সনাতনী বিদ্যার্থী সংসদের প্রতিষ্ঠাতা কুশল বরণ চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের গিরি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ওমেশানন্দ গিরি মহারাজ, বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের স্বামী বিপ্রানন্দজী ও শ্রী গোপীনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

মোল্লা-আলেমরা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অহরহ অবমাননা করছেন, জাতীয় সংগীতকে অপমান করছেন হামেশা। তারা প্রকাশ্যে বলেছেন, হিন্দুর লেখা সংগীত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে কোনো দেশদ্রোহিতার মামলা হয়েছে এমনটি কখনও শোনা যায়নি। জাতীয় পতাকা অবমাননার কয়েকটি ছবি এখানে সংযুক্ত করা হলো, যেখানে দেখা যাচ্ছে মোল্লারা ছাড়াও ছাত্রনেতারাও জাতীয় পতাকা পদদলিত করছে। □

দেশে বর্তমানে জারি থাকা ওয়াকফ আইনের সংশোধন কেন প্রয়োজন?

২০২৪-এর ৮ আগস্ট ওয়াকফ সংশোধনী বিল ও মুসলিম ওয়াকফ বিল পেশ করা হয়েছিল লোকসভায়। সেখানে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। বিরোধীরা যথারীতি স্বাভাবিক নিয়মেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ তুলেছে যে, ওয়াকফ সম্পত্তি অধিকার করার চেষ্টা করছে সরকার। সরকার পক্ষ যদিও সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে, ওই সম্পত্তির যাতে কোনও অপব্যবহার না হয়, তার জন্যই এই বিল পেশ করা হয়েছে। সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে গত ২৯ নভেম্বর 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলে'র ওপর যৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধীদের দাবিকে মর্যাদা দিয়ে কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল এর সময়সীমা বাড়িয়েছেন। সূত্রের খবর, আগামী বছর ফেব্রুয়ারির বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে তা জমা দেওয়া হতে পারে। কিন্তু প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি এ নিয়ে অপপ্রচার করেই চলছে।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে, এখানে ধর্ম দেখবেন না। তিনি টেনে এনেছেন সুরাট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রসঙ্গ। তাঁর বক্তব্য, 'সুরাট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সদর দপ্তরকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে আপনারা কল্পনা করতে পারেন? এটা কী করে সম্ভব?' কিরেন রিজিজু তাই সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, সংশোধিত ওয়াকফ বিল প্রস্তাবের সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নেই। তার কথায়, 'আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। হিন্দু বা মুসলমান নই, কিন্তু আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। এটাকে ধর্মীয় সমস্যা হিসেবে দেখবেন না। পুরসভা কি ব্যক্তিগত সম্পত্তি? পুরসভার সম্পত্তিকে কীভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করা যায়?' দেখা গেছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াকফ সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ উঠলেও, যেহেতু প্রশাসনের হাতে এই সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের কোনও ক্ষমতাই নেই, ফলে দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ এক শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে যেতে বিশেষ সময় লাগে না।

বিভিন্ন সময় ওয়াকফের আওতায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছেন অনেকে। প্রশ্ন উঠেছে ওয়াকফ বোর্ডের তরফে যেভাবে সম্পত্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই পদ্ধতি নিয়েও। এর পাশাপাশি গত দু'বছরে দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে ওয়াকফ সংক্রান্ত প্রায় ১২০টি পিটিশন জমা পড়েছে, যার পরে এই আইনে সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পিটিশনে ওয়াকফ আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলা হয়েছিল জৈন, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। অথচ মজার ব্যাপার হলো, স্বাধীনতার পর, ১৯৫৪ সালে দেশের সংসদে প্রথম যখন ওয়াকফ আইন পাশ হয়েছিল, তখন কিন্তু 'ওয়াকফ বোর্ডে'র হাতে এত বিপুল পরিমাণে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল না। পরে ১৯৯৫ সালে সেই আইন সংশোধন করে তৎকালীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নতুন আইন আনে। তাতে 'ওয়াকফ বোর্ড'কে কার্যত একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি করা হয়।

একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, সংখ্যালঘু তোষণের লক্ষ্যে, ভারতের বাইরে বিশ্বের আর কোনও দেশেই কোনোও ধর্মীয় বোর্ডের হাতে এতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। মুসলমান অধ্যুষিত দেশ বা আরব দুনিয়াতেও এই নজির নেই। গত প্রায় ৩০ বছরে ১৯৯৫ সালের আইনের হাত পড়েনি কখনোও। এবার সেই পুরনো ওয়াকফ আইনের খোলনোলচে বদলে নতুন আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র।

কে রহমান খানের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়েছিল ১৯৯৪-এর ওয়াকফ আইনের। যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) এবং পরে রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটি এই নিয়ে আলোচনা করে। সেখানে ওয়াকফ বোর্ডকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা খর্ব করা হয় এই নতুন প্রস্তাবিত বিলে। প্রস্তাবিত ওয়াকফ আইনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'ইন্টিগ্রেটেড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট'। সংশোধনী বিল অনুযায়ী, যে কোনো ব্যক্তি যিনি কমপক্ষে পাঁচ বছর ইসলাম অনুশীলন করেছেন এবং যার আলোচ্য জমির মালিকানা রয়েছে তিনি ওয়াকফ বোর্ডের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং ওয়াকফ জমি জরিপের দায়িত্ব জেলা শাসক বা ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পোর্টাল এবং ডাটাবেসের মাধ্যমে ওয়াকফের সম্পত্তি নথিভুক্ত করা হবে। এই পোর্টালের মাধ্যমে মুতাওয়াল্লি অর্থাৎ ওয়াক সম্পত্তির দেখাশোনার ভার যার ওপর, তার সমস্ত তথ্য দিতে হবে।

ওয়াকফ বোর্ডের হাত থেকে ক্ষমতা তুলে নেওয়ার পাশাপাশি নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, বর্তমান তিন সদস্যের ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালও তিন সদস্যের বদলে দুই সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে না। ৯০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া যাবে। রাজ্য স্তরে সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল এবং ওয়াকফ বোর্ডে দুজন অমুসলমান প্রতিনিধি রাখারও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নতুন সংশোধনীতে বোহরা ও আঘাখানি সম্প্রদায়ের জন্য একটা আলাদা ওয়াকফ বোর্ড প্রতিষ্ঠার সংস্থান রয়েছে। এককথায় এই প্রস্তাবিত ওয়াকফ ওয়াকফের নামে থাকা বিপুল সম্পত্তিকে আইনের শাসনের আওতায় নিয়ে আসতে চাইছে কেন্দ্র। যেন এদেশের বিপুল বিত্ত দেশ-বিরোধিতার কোনো কাজে ব্যবহার না হয় তা সুনিশ্চিত করতেই কেন্দ্রের এই উদ্যোগ। এর সঙ্গে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় 'অধিকার', 'ভাবাবেগ' ইত্যাদি ছেঁদো কথাগুলির যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, এই কথাটাই সর্বাগ্রে বুঝতে হবে। □

গুলশন কলোনি : আর কত মিনি পাকিস্তানের হদিশ মিলবে?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ ঈশানকোণের দিকে চলেছে। দিকভ্রম হচ্ছে জনবিন্যাসের। ইসলামিক অনুপ্রবেশের মন্ত্র গাথা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থেকে কলকাতার কসবা পর্যন্ত। আরও সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা, নাগরিক সুরক্ষা শাসকের হাতে পড়ে যতবার বলছে 'বজ্রযোগিন্যৈ নমঃ' ততবার তার শূন্যরূপ ধরা পড়ছে। অসুরক্ষার বজ্রখণ্ড পড়ছে হিন্দুদের ওপর। ভদ্র, সুস্থ সব নাগরিকের ওপর। এতদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তাঁর দক্ষিণ হাত ফিরহাদ হাকিম কলকাতাকে যে লন্ডন না বানিয়ে মিনি পাকিস্তান বানিয়েছেন তা বিলক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছে কসবা গুলশন কলোনির ছবি আবারও সামনে আসায়। বছর বছর ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। কখনও বাংলাদেশি চোরা ব্যবসায়ী। কখনও রোহিঙ্গা। আমাদের এত শ্রেণীবিন্যাসের দায় নেই। আমরা বলব কেন সবাই মানুষ? আমরা বলব ওই যে ওরা, ওরা কি বৈধ ভারতীয় নাকি পাশের ইসলামিক দেশ থেকে চোরা পথে অনুপ্রবেশকারী যার অভিসন্ধিতে ভারত বিরোধিতা, হিন্দুর ক্ষতি। তারা সবাই আমাদের বিচারে, ভারত সরকারের বিচারে, আইনের চোখে, এমনকী আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মস্ত সব কথার জালেও শুধুমাত্র 'মানুষ' বলেই উত্তীর্ণ হয় না। তারা সব দিক থেকেই অনুপ্রবেশকারী।

বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা নানা অভিসন্ধিতে পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতার মিনি পাকিস্তানে এবং আরও বড়ো পাকিস্তান কসবা গুলশন কলোনিতে থাকে, বৃদ্ধি পায়। তাদের জন্য রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ, গোয়েন্দা খুবই দুর্বল প্রতিপক্ষ। তাই গুলশন কলোনি তৈরি হয়, বাড়ে, শক্তি পেতে পেতে তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনঘনত্বের শহর ম্যানিলার থেকেও পাঁচ গুণ ঘিঞ্জি অঞ্চল হয়ে ওঠে। খোদ কলকাতার বুকে এত বড়ো পাকিস্তান গড়ে ওঠেছে। হিন্দুরা এই অঞ্চলে কোণঠাসা। তারা পালাল, পালাতে বাধ্য হলো। আমি আপনি পর্যন্ত জেনে গেলাম। সংবাদে এল। কিন্তু প্রশাসন জানে না! তবে তো বলতেই হয় মিনি পাকিস্তানের জন্য প্রশাসন অনেক ছাড়পত্র দেয়। কলকাতার যে কোনো মিনি পাকিস্তানে গেলে দেখা যাবে— ট্রাফিক পুলিশ ওখানে না-হেলমেট পরা যুবকটাকে দেখতেই পায় না। মিনি পাকিস্তানগুলোতে বারবার অবৈধ নির্মাণ থেকে অবৈধ ভোটার কার্ডের হদিশ মেলে।

রাজ্যের সংকল্প যে বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণ এবং ভোট বিশ্বাসঘাতকতা তা আবার প্রমাণ করল গুলশন কলোনি। তৃণমূল আমলে সব রকম চুরির ইতিহাস গঠন হলো, গঠন হলো জনবিন্যাস চুরির কারসাজিটাও। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা যে চোরের সেবা করে।

মিনি পাকিস্তান পকেটগুলোতেই অবৈধ সব রকম কম্ম চলে। ওসবতো আইনের বিশেষ ছাড়পত্র পায়। তাই পুলিশ প্রশাসন নিশ্চুপ, শান্ত। পুলিশের কর্তব্য ধর্মীয় শান্তি বজায় রাখা। তাই বাংলাদেশি জামাতিরা, রোহিঙ্গারা ঘাঁটি তৈরি করলেও তাদের না দেখার ভান করে প্রশাসন। ২০১১-র পর থেকে প্রায় ৩৫০০০ বর্গমিটার জলাভূমি ভরাট করে তৈরি হয়েছে গুলশন কলোনির একাংশ। যার জনঘনত্ব প্রায় ৫.৫ লক্ষ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনঘনত্বের শহর ম্যানিলার চাইতেও ৫ গুণ বেশি! একটু অনুমান করা যাক, কী হাল ওই কলোনির! এই কলোনির বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক ২ লক্ষ। কিন্তু মজা কথা হলো, এই কলোনির ভোটার সংখ্যা মাত্র ২,৮০০। সরকারি সমীক্ষাতে উঠে এসেছে এই তথ্য।

২০২৩-এ স্বাস্থ্য দপ্তর এক সমীক্ষা চালায়। যেখানে দেখা গেল আনুমানিক ৭০০ অবৈধ বহুতলে বাস করে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার মানুষ। তাহলে এরা কারা? এত মানুষ যাদের ভোটার কার্ড নেই? নেই আপাতত। এবার কি ধীরে ধীরে অবৈধ নির্মাণের মতো অবৈধ কার্ডটাও হবে? কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিই বলেছিলেন তিনি বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের জায়গা দেবেন। ২০১৮-তে যখন বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের ভারত সরকার অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করছে, প্রমাণিত হচ্ছে ওরা ভারত বিরোধী চক্রান্তের কর্মী; ঠিক সেই সময়েই কলকাতার থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হাড়দহতে পাকাপাকি রোহিঙ্গা ক্যাম্প গড়ে ওঠে। হুসেন গাজির নেতৃত্বে তৈরি হলো 'দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি' যারা রোহিঙ্গাদের বাসস্থান সুরক্ষার পক্ষে পালে বাতাস দিচ্ছিল। কিন্তু এই হুসেন গাজির কাছে রাজ্য সরকার তলব করে জানতে চায়নি কেমন করে ওই রোহিঙ্গাদের দল এল এদেশে। বারুইপুর পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট অরিজিৎ সিনহা সেই সময় বলেছিলেন ওদের কাছে UNHCR কার্ড আছে, অর্থাৎ ওরা রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমোদিত শরণার্থী। তাই ওদের পাসপোর্ট বা কোনো পরিচয় প্রমাণ দরকার নেই। ভারী মজার কথা এই প্রশাসন, রাজ্য মুখ্য প্রশাসক একজনও বলে না বাংলাদেশের পালিয়ে আসা হিন্দুরা প্রকৃত শরণার্থী। ওদের জন্য সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের কথা বললেই তখন কিন্তু এই মিনি পাকিস্তান থেকে সরব বিপ্লব দেখা যায়। রাজ্য সরকারের কষ্ট কিন্তু শুধু রোহিঙ্গাদের জন্য। তাই মমতা ব্যানার্জি বলেন রোহিঙ্গারা আমাদের ভাই। ওদের মানুষ হিসেবে

ফঃ ২

দেখতে হবে, অনুপ্রবেশকারী নয় ওরা। দেখার বড্ড তারতম্য প্রশাসনের, তাই গুলশন কলোনি হয়ে ওঠে রোহিঙ্গাদের ঘাঁটি। বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা চোরা পথে শাড়ি, মাছ, আনাজ লেন-দেন করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। অনুপ্রবেশকারীদের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু সন্ত্রাস তৈরি তাই একজন অনুপ্রবেশকারীকে কেবলমাত্রই 'মানুষ'-এর দৃষ্টিকোণে দেখা মানে নিজেদের সুরক্ষার পূর্ণগ্রাসের আয়োজন।

কসবা গুলশন কলোনিতে কি ঘটল? সম্প্রতি কী চাঞ্চল্যকর তথ্য এল, সেটাই দেখি। বর্ধমানের গলসীতে মূলচক্রী ইকবাল ধরা পড়ল। যে ২০১১-১২-তে গুলশন কলোনিতে ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড, অবৈধ চারতলা বাড়ি নির্মাণ করে। ওই বাড়ি নিয়ে চরম বিবাদ। ঝঞ্ঝাট। অভিযোগ, ওই বাড়ি দখল করে নেয় হায়দার আলি। তিনি আবার স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামী। সেই বদলা নিতেই কাউন্সিলরকে খুনের ছক। নিজের বাড়িতে আক্রান্ত কাউন্সিলর। যেহেতু তৃণমূল কাউন্সিলর আক্রান্ত, যেহেতু গুলি চলল, যেহেতু ইকবাল পালাল সেহেতু পুলিশ বাধ্য হলো তাড়া করতে। এবং তাই গুলশন কলোনির কদর্য অনৈতিক ছবি আংশিক তথ্য ধরা পড়ছে। অনুপ্রবেশকারীরা যে গুলশন কলোনির মালিক তা স্থানীয় মানুষরাই বলছে। এ এক এমন কলোনি যেখানে সব দেশবিরোধী সমাজবিরোধী চক্র চলে। যা দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল। তৃণমূল কাউন্সিলরের উদ্দেশ্যে গুলি চললে তখন পুলিশ 'ব্যবস্থা' নেওয়ার মতো কিছু করে। যেহেতু রাজনৈতিক মদতে সবটাই হয় তাই কিছু পরে আবার পুলিশের বুটের শব্দ থেমেও যায়। ২০২২-এ শুরু, এই গুলশন কলোনি থেকেই ২২ জন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। না, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ করেনি।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এল, তবেই হলো। ২০২১-এ এই কলোনিতে তল্লাশি চালিয়ে একটা বাড়ি থেকেই ১৬টি তরতাজা বোমা উদ্ধার হয়। সব বাড়িতেই বারুদ। অস্ত্র। মার্টিন পাড়া, যেখানে ইকবাল বাড়ি করেছিল— সেখানে জনসংখ্যা এক লক্ষ। কী জাদুঘর ওই পাড়া, ভোটার মাত্র ১৫০০ জন! দখল সরকারি জমি। চলছে অবৈধ বাড়ি তৈরিও অনৈতিক কাজ। এরা যারা ভোটার কার্ড না ধরেও পঙ্গপালের মতো থাকছে কলকাতার বুকে, পাকিস্তান অনুভূতি যাদের বুকে কলকাতাতেই তারা ভোটের মেশিনারি। ভোট নাই-বা দিল। কিন্তু সন্ত্রাস তো করে। ভোটার কার্ড কী দরকার। ছাপ্পার কাজতো করতেই পারে। এলাকা দখলের সৈন্য যে এরাই। অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকলাপ সারা পশ্চিমবঙ্গেই হুবহু গুলশন কলোনির মতোই।

২০০৯-এ ১৯ জানুয়ারি স্বস্তিকায় প্রতিবেদন ছিল 'খোদ কলকাতাতেই বাংলাদেশি জঙ্গিদের ঘাঁটি'। তারপর এক দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত। স্বস্তিকাতে আবারও এক বিষয় অধিক গুরুত্ব যোগে প্রকাশ করতে হচ্ছে। কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে বসে ভুয়ো নথি এ পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। একথাতো রাজনৈতিক প্রচারে গত বছর নভেম্বরে বারাসতের তৃণমূল নেত্রী রত্না বিশ্বাস নিজেই বলেছেন। বলেছিলেন, 'তিনমাস পরেই লোকসভা নির্বাচন। ভোটার লিস্টের কাজ চলছে। জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক বসবাস করেন। জাকিরদা লিংকটা ভালো করতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন যদি তাঁদের ভোটার লিস্টে নাম তুলতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে জাকিরদার এই অফিসে এসে যোগাযোগ করবেন। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন। আমরা চাই না একটি ভোটও বাইরে পড়ুক।' এই কথাতে যেন ২০১৭-তে সুর সংযোজিত হয়। সেবছর সেপ্টেম্বরে ধর্মতলা অবরুদ্ধ। তীব্র যানজট। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সুরক্ষার দাবিতে কলকাতার মিনি পাকিস্তানের মুসলমানরা একজোট। সমর্থন বাম- কংগ্রেসের। নীরব মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক তার পরের বছরই কলকাতার বুকে এক ফ্যাশন শো-তে মানবাধিকারের ধ্বজা ধরে ramp walk করল ছ'জন রোহিঙ্গা মেয়ে। যতবার জঙ্গিযোগ পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গে, ততবার দেখা গেল তারা বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী। রোহিঙ্গারাও সন্ত্রাসী।

সন্দেশখালি নারী নির্যাতনেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌরাত্ম্য। বাংলাদেশের যশোর, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ থেকে নিত্যদিন অনুপ্রবেশকারীরা আসছে। হবিবপুর, মুচিয়া, বৈষ্ণবনগর সীমান্ত যার মধ্যে খুব সাধারণ নাম। তারা কাঁটাতারের জমি টপকেই বদলে ফেলছে নাম, পরিচয়। হয়ে যাচ্ছে জমি মাফিয়া। একথা কিছুদিন আগে বাংলাদেশেরই এক অনুপ্রবেশকারী শহিদুল বলছে, যশোর মোল্লাপাড়ার চেয়ারম্যান তাকে পাঠায় এদিকে। মালদা হবিবপুরের গ্রামবাসীরা সন্দেহ করে এবং ধরে ফেলে। তারপর সত্যি গরল উগরে ফেলল। বাম আমল থেকে এই ট্র্যাডিশন চলছে। ২০২২-এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটি বৈঠক করে। সেখানে মমতা ব্যানার্জিকে বারবার বলা হয় বাংলাদেশ সীমান্তের ৭২টি অঞ্চল আছে যা অনুপ্রবেশকারীর মুক্তাঞ্চল। সেগুলি চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার জমি দিলে তবেই বিএসএফ কাঁটাতার ও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু জমি এখনও পেল না বিএসএফ। আজ থেকে নাকি? ২০০৮ সাল থেকেই অনুপ্রবেশ সমস্যা বার বার উঠেছে। তৎকালীন কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল একটি রিপোর্ট দেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার শাসনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার জন্যে সীমান্তে ভিড় করছেন সে দেশের হিন্দুরা। এই সুযোগে আরও বেশি করে আসছে জঙ্গি অনুপ্রবেশকারীরা।

২০০৬-এর ১৫ এপ্রিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কলকাতা প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনিই বলেন জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটছে। তারপর এল তৃণমূল। বদল এমনই হলো যেখানে জামাত উলেমা-ই-হিন্দের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী রাজনৈতিক সরকারি তাবড়দের একজন হন। তারপর অসংখ্য ঘটনা। প্রতি মাসে রিপোর্ট আসে মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি, জঙ্গি ঘাঁটি, বাংলাদেশের জঙ্গি যোগ, ছদ্মপরিচয়ে বাংলাদেশি জঙ্গি, রোহিঙ্গা পেলো ভুয়ো পরিচয়পত্র, জাল পরিচয়পত্রে বাংলাদেশি আটক..., খবর আর শিরোনাম। কলকাতার খিদিরপুর থেকে পার্ক সার্কাস, তপসিয়া থেকে কসবা, সুন্দরবন অঞ্চল থেকে শিলিগুড়ি যতদূর সীমান্ত তত দূর পর্যন্ত অনুপ্রবেশ জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য ওঁত পেতে থাকে বাংলাদেশি। বাঙ্গালিকে জঙ্গি কুৎসা দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে এর চেয়ে হতভাগ্য আর কী আছে। কিন্তু জঙ্গিরা বাঙ্গালি নয়। ওরা জেহাদি অনুপ্রবেশকারী। ওরা ভারত বিদ্বেষী। পশ্চিমবঙ্গকে ওরা মুক্তাঞ্চল মনে করে, কারণ ওদের মদত দেয় আশ্রয় দেয়, রাজনৈতিক শাসকের একাংশ। কসবার গুলশন কলোনি আরও একবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা সন্ত্রাস তত্ত্বকে পুনর্নির্মাণের ঠাঁই দিল।

এই সত্যে রং নেই, তাই শাসকের সংশোধনের তোড় নেই। রাজ্যের সংকল্প যে বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণ এবং ভোট বিশ্বাসঘাতকতা তা আবার প্রমাণ করল গুলশন কলোনি। তৃণমূল আমলে সব রকম চুরির ইতিহাস গঠন হলো, গঠন হলো জনবিন্যাস চুরির কারসাজিটাও। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা যে চোরের সেবা করে □

ওয়াকফ সংশোধনী বিল

জাতীয় স্বার্থরক্ষায় এক যুগান্তকারী উদ্যোগ

ধর্মানন্দ দেব

'ওয়াকফ' শব্দটি আরবি ভাষা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো 'অবরুদ্ধ করা' বা 'নির্ধারণ করা।' ইসলামি শরিয়ায় এটি এমন একটি মজহবি প্রতিষ্ঠান, যা মজহবি বা জনহিতকর কাজে ব্যবহারের জন্য স্থাপন করা হয়। ওয়াকফের মাধ্যমে নাকি একবার সম্পত্তি নিবেদিত হলে তা চিরস্থায়ীভাবে ওই কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে এবং এর মালিকানা পরিবর্তন সম্ভব হয় না। ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পৃথক আইনি কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিতর্ক ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

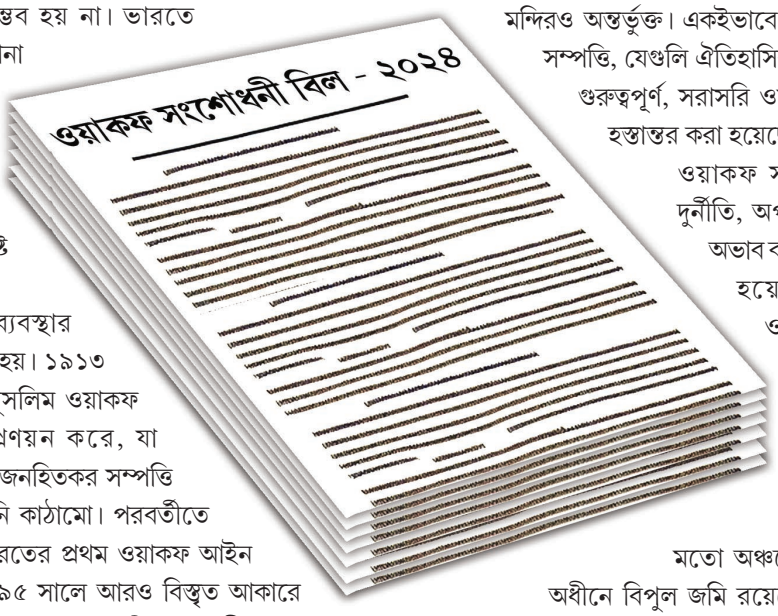

ভারতে ওয়াকফ ব্যবস্থার সূচনা ব্রিটিশ শাসনামলে হয়। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ সরকার 'মুসলিম ওয়াকফ ভ্যালিডেটিং অ্যাক্ট' প্রণয়ন করে, যা মুসলমানদের মজহবি ও জনহিতকর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার প্রথম আইনি কাঠামো। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম ওয়াকফ আইন প্রণয়ন করা হয়, যা ১৯৯৫ সালে আরও বিস্তৃত আকারে সংশোধন করা হয়। ২০১৩ সালের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যা বর্তমানে বহু সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান সময়ে ভারতে প্রায় ৮.৭ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যার মোট আয়তন প্রায় ৯.৪ লক্ষ একর। এই সম্পত্তিগুলি মূলত মসজিদ, কবরস্থান, দরগা এবং জনহিতকর কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে বাস্তবতা হলো, এই বিশাল সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের অভাবে এটি আজও জাতীয় আয়ের একটি বড়ো উৎস হিসেবে রূপান্তরিত হতে পারেনি। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে সম্ভাব্য বার্ষিক আয় হতে পারে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা কিন্তু বতমানে তা ২০০ কোটি টাকারও কম।

১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন এবং এর পরবর্তী সংশোধনীগুলি ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। ওয়াকফ বোর্ড যে কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করতে পারে এবং একবার এই ঘোষণা হয়ে গেলে তা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ কার্যত থাকে না। এই আইনি কাঠামোর কারণে বহু সময়ে জনসাধারণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে দাবি করা হয়েছে, যা সম্পত্তির প্রকৃত মালিকদের জন্য গভীর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে, তামিলনাড়ুতে ওয়াকফ বোর্ড ৬টি গ্রামকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে একটি হিন্দু মন্দিরও অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে দিল্লিতে ১২৩টি মূল সম্পত্তি, যেগুলি ঐতিহাসিক ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সরাসরি ওয়াকফ বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, অপব্যবহার ও স্বচ্ছতার অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ বোর্ডের জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো অঞ্চলে ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে বিপুল জমি রয়েছে, যার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ আইন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং মুসলিম ওয়াকফ (রিপিল) বিল, ২০২৪-এর মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডের অতিরিক্ত ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এই প্রস্তাবিত আইন সংস্কারের মূল লক্ষ্য হলো :

১. ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা হ্রাস করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২. ওয়াকফ সম্পত্তির ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি করা, যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৩. ওয়াকফ বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরাসরি হাইকোর্টে আপিলের ব্যবস্থা করা।

৪. বোর্ডে অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, যাতে এর কার্যক্রমে সাম্প্রদায়গত ভারসাম্য বজায় থাকে।

তবে, এই আইনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস এবং কিছু

আঞ্চলিক দল। তাদের মতে, এই উদ্যোগ মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করবে। বাস্তবতা হলো, এই বিরোধিতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ভোটব্যাংককে রক্ষার কৌশল মাত্র। ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল বহুদিন ধরে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করে আসছে।

ওয়াকফ বোর্ডগুলির ক্ষমতার অপব্যবহার এবং এর মাধ্যমে জাতীয় সম্পত্তির অপচয় বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দুর্নীতির অভিযোগ, দিল্লি এবং জম্মু ও কাশ্মীরে জমি দখলের ঘটনা, এবং তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক বিতর্ক এই সমস্যাগুলিকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে আইনি সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগে কেবল ওয়াকফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই সম্ভব হবে না, বরং এটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে এই জমিগুলিকে ব্যবহারের দিকেও পথ খুলে দেবে। ভারতে বর্তমানে বহু প্রতিষ্ঠান, স্কুল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রকল্পের জন্য জমির প্রয়োজন, যা ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহার করে পূরণ করা সম্ভব।

তবে, বিরোধী দলগুলি এই সংস্কারকে ধর্মীয় সংবেদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে কিছু দল প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে এটিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই আইনের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। ওয়াকফ সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনা হলে তা মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমান ওয়াকফ আইনের অসংগতি এবং এর কারণে উদ্ভূত সমস্যা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কেবলমাত্র জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হবে না, বরং ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারও নিশ্চিত হবে।

প্রস্তাবিত আইন সংস্কার কেবলমাত্র একটি আইনি পদক্ষেপ নয়, বরং এটি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ।

ভারতে ওয়াকফ আইনের দীর্ঘ ইতিহাস এবং এর সঙ্গে জড়িত বিতর্ক বুঝতে হলে আমাদের এর মূল কাঠামো এবং বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। শুধুমাত্র ধর্মীয় সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে নয়, বরং বাস্তব ও আইনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রস্তাবিত আইন সংস্কার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রণীত হয়েছে।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে সকল ধর্মের প্রতি সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা ভারতের একটি মৌলিক দায়িত্ব। ওয়াকফ আইন সংস্কারের মাধ্যমে এই নীতির সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব। বিরোধী দলগুলির উচিত রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থে এই পদক্ষেপকে সমর্থন করা। এর মাধ্যমে কেবলমাত্র ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে না, বরং ওই সম্পত্তিগুলিকে জনহিতকর কাজে ব্যবহারের পথ সুগম হবে।

ওয়াকফ আইন সংস্কার নিয়ে চলমান বিতর্ক ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে; ধর্মীয় সংস্থাগুলির অধিকার এবং জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে প্রস্তাবিত আইন সংস্কার কেবলমাত্র একটি আইনি পদক্ষেপ নয়, বরং এটি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। বিরোধী দলগুলির উচিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণে বাধা সৃষ্টি না করে জাতীয় স্বার্থে এই সংস্কারকে সমর্থন করা। এর মাধ্যমে ভারত একটি উন্নত, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলা শিবির-২০২৫

ব্রহ্মচারী শ্রীহৃষীকেশ মহারাজজী দ্বারা পরিচালিত শিবশক্তি সেবাধাম প্রতি বছরের মতো আগামী ২০২৫ সালে প্রয়াগরাজ পূর্ণকুম্ভমেলাতে শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে। শিবশক্তি সেবাধাম যেভাবে অন্যান্য কুম্ভমেলাতে তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও তীর্থভ্রমণের সুব্যবস্থা করে থাকে, সেভাবেই প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলাতেও সমস্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। শিবির ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট হওয়াতে পুণ্যস্নান সহজ হবে। শিবিরের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক তীর্থযাত্রীরা অগ্রিম বুকিং করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। কুম্ভমেলায় সন্তভাণ্ডারা, ব্রাহ্মণভোজন ও সেবাদানের মতো পুণ্যকাজে দানধ্যান করতে ইচ্ছুক ভক্তরা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দান করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে ফোনেও যোগাযোগ করা যাবে।

Google Pay/ PhonePe No.- 9451268600

D.47/49,Ramapura.(Opposite of Mazda Cinema Carparking), Varanasi (UP).

Mob. No. - **9451268600, 7985210182.**

Bank Account datails- Name— Hrishikesh Brahmachari.

A/C No - 34903180246. IFSC -SBIN0001190

State Bank of India (SBI), Varanasi, U.P.

বিঃ দ্রঃ- আধার কার্ড, পাসপোর্ট সাইজের দুটি ছবি এবং ১টি বিছানার চাদর সঙ্গে আনতে হবে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কি আন্তর্জাতিক স্তরে ?

ডিপ স্টেট চায় ভারত চিরদিনের জন্য অনুন্নত থাকুক। বহু পুরোনো গতানুগতিক ব্যবস্থা চলুক আগের মতোই। ওয়াকফ আইন সংশোধন হলে তা আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠবে। তাই সেই আইনের সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রাচীর তৈরি করতে পারে বিভিন্ন শক্তি।

বিমলশঙ্কর নন্দ

১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁদের 'ম্যানিফেস্টো অব দ্য কমিউনিস্ট পার্টি' বইয়ে দুনিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীকে এক হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল শ্রমিকদের কোনো দেশ নেই, জাতি নেই। তাদের একটাই পরিচয়— তারা হলো শ্রমিক। 'পুঁজিবাদী শোষণ'-এর বিরুদ্ধে সব দেশে তাদের লড়াই করতে হবে। তাহলেই কেবল তারা জয়ী হতে পারবে। এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করে কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকরা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার তত্ত্বও তৈরি করেছিলেন। এক সময় গোটা পৃথিবীর কমিউনিস্ট সমর্থকেরা এই সব তত্ত্ব, স্লোগান প্রভৃতি নিয়ে প্রচুর আলোচনা করতো। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা কমে গেছে। এখনও বামপন্থী দলগুলো মিটিং মিছিলে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান তোলে। তবে সেই কণ্ঠ ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। কারণ কমিউনিস্ট মতাদর্শই তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে ইসলামের একটা ভাবনাগত মিল আছে। ইসলামে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরাও মনে করেন দুনিয়াজোড়া ইসলামে বিশ্বাসীদের স্বার্থ এক। প্রয়োজনে তাঁদের একসঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। ইসলামিক স্টেট ইরাক বা সিরিয়াতে জেহাদের ডাক দিলে এশিয়া, আফ্রিকা এমনকী ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের মনকে তা আন্দোলিত করে। জেহাদে অংশ নিতে এই সব অঞ্চল থেকে অনেকে পৌঁছে গিয়েছিল মধ্য প্রাচ্যের এই দেশগুলিতে। জেহাদের স্বপ্ন ভাঙতে তাদের খুব বেশি দেরি হয়নি অবশ্য। জেহাদে অংশ নিতে গিয়ে কারোর প্রাণ গেছে, কারোর ঠাঁই হয়েছে জেলে। কেউ কেউ জেহাদের স্বপ্ন ভুলে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করছে। ইসলামিক স্টেটের ইতিবৃত্ত পড়লে এরকম বহু তথ্য সামনে আসবে। অতি সম্প্রতি আর এক ধরনের আন্তর্জাতিকতার নমুনা দেখা গেল ভারতে একটি আইন সংশোধনকে কেন্দ্র করে। কেন্দ্রীয় সরকার বহু পুরোনো একটি ব্যবস্থাকে সংশোধন করে তাকে আধুনিক যুগের উপযোগী করার চেষ্টা করছে। প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে তা আইনে পরিণত হলে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বহু অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের অবসান হবে। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিরোধী দলগুলোর দাবি মতো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলকে আরও বিচার বিবেচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠিয়েছে। এই বিল নিয়ে সকলের মতামত আহ্বান করা হয়েছে। সেই বিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলার নাটক গোটা দুনিয়া দেখেছে। এবার এই বিল নিয়ে অভিযোগ উঠলো আন্তর্জাতিক স্তরের চক্রান্তের। মার্কস-এঙ্গেলসের 'উদাত্ত' আহ্বান সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সমাজ কিংবা আইন ব্যবস্থা সংস্কারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত যে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছাতে পারে তা প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল দেখিয়ে দিল।

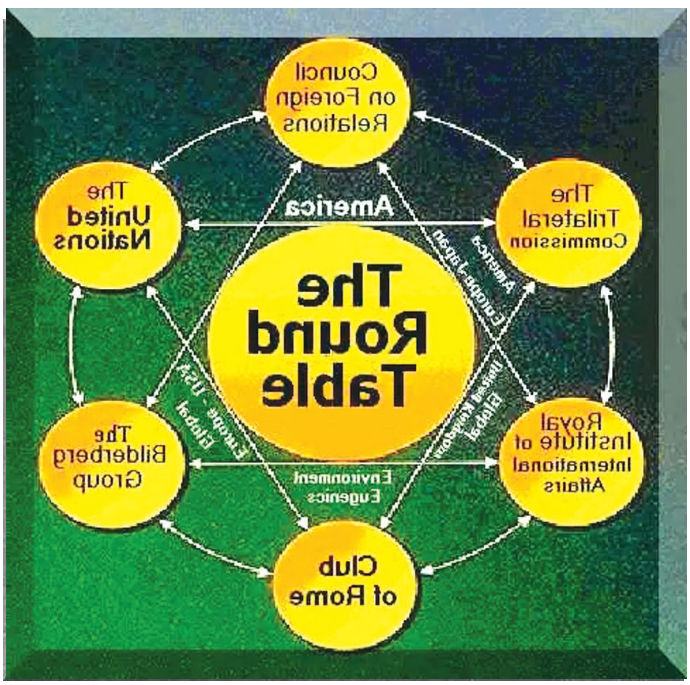

বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঝাড়খণ্ড থেকে নির্বাচিত ভারতীয় জনতা পার্টির

লোকসভা সদস্য নিশিকান্ত দুবের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন নিশিকান্ত দুবে। শ্রী দুবে বলেছেন, ওয়াকফ বিল নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটি জনসাধারণের মতামত চেয়েছিল। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ১.২৫ কোটি মতামত আসে। এই মতামত এবং তাদের মধ্যেকার বক্তব্যগুলো দেখে সন্দেহের উদ্রেক হয়। এই সমস্ত মতামত ভারতের মধ্যে তৈরি হয়েছে তো? নাকি ভারতের বাইরের শক্তিও এ ব্যাপারে প্রভাব খাটানো শুরু করেছে। শ্রী দুবে সন্দেহ করেন যে ভারত থেকে পলাতক ইসলামি নেতা জাকির নায়েক, পাকিস্তানের আইএসআই, আফগানিস্তানের তালিবান এমনকী চীনও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে বলে সন্দেহ করার কারণ আছে। ভারতের সংসদ এবং আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্য দেশের হস্তক্ষেপ হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা উচিত বলে তিনি দাবি করেন।

যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে লোকসভার চারবারের এমপি নিশিকান্ত দুবে যখন বিদেশি হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেন তখন তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ এর সঙ্গে দেশের স্বাতন্ত্র্য এবং সার্বভৌমিকতার প্রশ্নটি যুক্ত। সাম্প্রতিককালে কিংবা নিকট অতীতে একটি দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য দেশের হস্তক্ষেপ নতুন নয়। বরং তা বারে বারে ঘটে চলেছে। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে একটি চরম মোল্লাবাদী সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর ক্ষেত্রে একটি উন্নত পশ্চিমি দেশের 'ডিপ স্টেট'-এর ভূমিকা গোটা বিশ্বে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু। ভারতের শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের হস্তক্ষেপ হওয়ার আগেই কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে যোগাযোগ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক কিংবা অন্যান্য স্বার্থে অন্য দেশের সার্বভৌমিকতা লঙ্ঘন করে চলেছে অবিরত। এই ধরনের হস্তক্ষেপ নিয়ে যারা চর্চা করেন তাঁরা সাম্প্রতিককালে ডিপ স্টেটের ভূমিকার উল্লেখ করছেন। ডিপ স্টেট হলো একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা কিছু শক্তি যারা সেই দেশের সরকারকে গোপনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই দেশের সরকারি তন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থে অন্য দেশে হস্তক্ষেপ করে। বাংলাদেশ এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষত বিগত শতাব্দীতে ৬০ এবং ৭০-এর দশকে এই হস্তক্ষেপ বার বার ঘটেছে। আর এর শিকার হয়েছে এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলো।

ডিপ স্টেটের লক্ষ্য একটাই। অন্য দেশে যাতে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে তার জন্য ওরা সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে। দেশের সরকারকে দিয়ে সেই দেশের নীতি নির্ধারণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা হয়। নীতি যদি মনোমতো না হয় তখন শুরু হয় হস্তক্ষেপ। প্রথমে হয় পরোক্ষ হস্তক্ষেপ। তার পরই প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপও হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ভারত একটি উন্নতিশীল দেশের তকমা নিয়েই খুশি ছিল। ভারত ছিল বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর উৎপাদিত পণ্যের বৃহৎ বাজার। সমরাস্ত্রের সবচেয়ে বড়ো আমদানিকারী। ২০১৪ থেকে ভারতের নীতির পরিবর্তন হচ্ছে। মেক ইন ইন্ডিয়া নীতি, ভারতকে বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করার চেষ্টা ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য স্থানে উপনীত করেছে। ভারত এখন সমরাস্ত্র রপ্তানি করে। আর্থিক সংস্কারের সঙ্গে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিয়ে সরকার নজর দিয়েছে আইন ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে। চেষ্টা চলছে এক আধুনিক উন্নত সমাজ এবং অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করার। ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠতে চলেছে ভারত। উন্নত দেশগুলোর এসব পছন্দ হওয়ার কথা নয়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার তাদের চক্ষুশূল। ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান তাদের কাছে অসহ্য। তাই হস্তক্ষেপ আসছে নানা দিক থেকে।

ডিপ স্টেট চায় ভারত চিরদিনের জন্য অনুন্নত থাকুক। বহু পুরোনো গতানুগতিক ব্যবস্থা চলুক আগের মতোই। ওয়াকফ আইন সংশোধন হলে তা আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠবে। তাই সেই আইনের সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রাচীর তৈরি করতে পারে বিভিন্ন শক্তি। তাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন। কারণ যতই আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করি জাতীয় সার্বভৌমিকতার কোনো বিকল্প নেই। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপোশ নেই। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

ওয়াকফ বোর্ডের ইতিকথা

ভাস্কর ভট্টাচার্য

ভারত ভাগের পর ভারতের যত মুসলমান সম্পত্তি, যা তারা ছেড়ে গিয়েছিল সেগুলি এই ওয়াকফ বোর্ড গঠন করে তার অধীনে আনা হয়। আর পাকিস্তানের যত ভারতীয় সম্পত্তি, যা তারা ছেড়ে চলে এসেছিল, সেগুলি প্রায় সব 'এনিসি প্রপার্টি অ্যাক্ট' নামক কালা কানুনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সরকার অধিগ্রহণ করে বা বলতে গেলে সেই সম্পত্তিগুলি মুসলমানদের অধীনে চলে যায়। দ্বিচারিতা তখন থেকেই শুরু।

প্রথমেই বলে রাখি, 'সংখ্যালঘু'র কোনো সংজ্ঞা ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া নেই। ফলে দেশের মধ্যে অনেক জেলা আছে যেখানে সেই অর্থে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। অথচ সরকার মান্যতা দেয় না। অথচ সংখ্যালঘু দপ্তর, তার মন্ত্রী, তার সেল, সবই দিব্যি চলছে।

ওয়াকফ শব্দটি আরবি থেকে নেওয়া। যার অর্থ কোনো সম্পত্তি যা আল্লার নামে উৎসর্গীকৃত। কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ডিক্রি জারির জন্য প্রথম যে কমিশন তৈরি হয়েছিল তা ১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের দ্বারা। তারপর বোর্ড তৈরি হয় ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ রাজত্বে। মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড অ্যাক্ট ১৯২৩ হয় রাজ্যে সঠিকভাবে এর সম্পত্তির বিজ্ঞাপন, হিসেব ও প্রশাসন চালাবার জন্য। এরপর ১৯৫৪ সালে নতুন আইন বা অ্যাক্ট হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৬৪ সালে তৈরি হয়--- সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে তৈরি হয় --- ওয়াকফ বোর্ড। পরবর্তীকালে ১৯৯৫ সালে এই ওয়াকফ আইন আবার সংশোধিত হয়, যা কংগ্রেসের আমল। এর কাজ ছিল ওয়াকফ এর ট্রাস্টের মাধ্যমে গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য দাতব্য জনহিতকর কাজ করা। আশ্চর্যের বিষয় হলো পাকিস্তানে হিন্দুদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোনো হিন্দুবোর্ড হলো না। অথচ ভারতে কংগ্রেস সরকার ব্রিটিশদের দ্বারা তৈরি এই ওয়াকফ বোর্ডকে আরও শক্তিশালী করল যাতে মুসলমানদের ভোট পাওয়া যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রবাদ বাক্যের কথা মনে পড়ে গেল 'A stitch in time save nine' অর্থাৎ ঠিক সময় একটা সেলাই নটা সেলাই থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু তা হলো না। ভোটের লোভে কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিরোধী দল এই ভয়ানক আইনকে রক্ষা করে চলেছে দেশের কথা নয়, ভোটের কথা ভেবে। এমনকী যে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আরজি কর মামলা নিজের হাতে নেয়, সেই আদালতও মনে করেনি এই অন্যায়, বেনিয়ম একটা সংস্থা কী করে চলতে পারে ভারতের বুকে যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানরা দেশ ভাগ করে পাকিস্তান তৈরি করেছে। কোনো মুসলমান দেশে এই ওয়াকফ বোর্ড নামক কোনো সংস্থা নেই। এমনকী পাকিস্তানেও নেই। এটা চলছে পিছনের দরজা দিয়ে এমার্জেন্সির সময় ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা সেকুলার শব্দকে সংবিধানে আনার জন্য। যা নিয়ে সংসদে নতুন করে বিতর্ক হওয়া দরকার।

এই ওয়াকফ বোর্ড কীভাবে চলছে তার ছোট্ট নমুনা দিচ্ছি। এরা যে কোনো সম্পত্তি, জমি, জায়গা, এই বোর্ড ঘোষণা করে তাদের কবজায় নিতে পারে। একটা গোটা গ্রামকে তারা ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করেছে এমন উদাহরণ রয়েছে। অথচ সেই গ্রামের জন্মের সময় এই ওয়াকফ বোর্ডই ছিল না।

ভারতের সপ্তম আশ্চর্য তাজমহলকেও ওয়াকফ সম্পত্তি করে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে বহু সরকারি জমি, হিন্দু মন্দির পর্যন্ত এমনকী আপনার, আমার সম্পত্তিকেও এরা এভাবে কেড়ে নিতে পারে বর্তমান ওয়াকফ আইনে। এদের নিজস্ব শরিয়ত কোর্ট আছে যেখানে মুসলমানরাই বিচারক। তারাই ঠিক করবে আপনার সম্পত্তি আপনার না ওয়াকফের। কোনো দলিল গ্রাহ্য হবে না। কোনো কোর্টে বিচার হবে না।

বর্তমানে ভারতে এদের মোট জমি বা সম্পত্তির পরিমাণ ৯.৪ লক্ষ একর জমি। সারা দেশে ৩২টা ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে। ভাবুন, এই ভাবে জমি অন্যায্য দখলের মাধ্যমে আগামীদিনে ভারতে আর একটি পাকিস্তান সৃষ্টি হতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমরা কাছের জিনিস দেখতে পাই। দূরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকি।

বর্তমান বিজেপি সরকার এবং দেশপ্রেমী প্রধানমন্ত্রীর এই দূরদৃষ্টি আছে। তারা কোনো চাটুকারিতায় ভোট নিয়ে ক্ষমতায় থাকার

বিরুদ্ধে। কারণ দেশে ১৪০ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা বন্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী নতুন আইন এনেছেন সংসদে এই ওয়াকফ বিল ২০২৪। যা নিয়ে মুসলমান ভোট নিয়ে রাজনীতি করা নেতাদের গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে, তাদের দোকান বন্ধের আশঙ্কায়। ফলে, যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাড়ার মাস্তানদের মতো কাচের বোতল ভেঙে চেয়ারম্যানের দিকে ছুঁড়ে আঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এরা করবে দেশ রক্ষা! এবার সরকারকে ভাবতে হবে ডি-ভোটার করার আইন আনার, এক শ্রেণীর জন্য যারা দেশকে আবার ভাগ করতে চায়। যারা হিন্দুবিদ্বেষী।

বর্তমান আইন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু জানাবার চেষ্টা করছি তাদের জন্য যারা তোষামোদের রাজনীতি করছে।

১. সেই ব্যক্তিরই উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে যে টানা পাঁচ বছর ইসলামি আচরণ করছে। ওয়াকফ-আলাল-আওলাদ-এর আইনি সংস্থানের ফলে দান হয়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে সংগৃহীত আয় দাতার সন্তান এবং তাদের বংশধরদের কাছে যাবে, অর্থাৎ দাতা ও তার আইনত উত্তরসূরিরা তাদের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত হবে না।

২. সরকারি সম্পত্তির ওপর ওয়াকফের কোনো অধিকার থাকবে না। কালেক্টর বা জেলা রাজস্ব আধিকারিক ঠিক করবেন কোনটা ওয়াকফ, কোনটা নয় সঠিক দলিল বা দস্তাবেজের ভিত্তিতে। এবং তার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে প্রদান করবেন।

৩. কোনো সম্পত্তি ওয়াকফের কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা ওয়াকফ বোর্ডের হাতে থাকবে না।

৪. এই আইন কোনো জরিপ করার জন্য জরিপ বা সার্ভে কমিশনার ও অ্যাডিশনাল কমিশনার নিযুক্ত করবে ওয়াকফ সম্পত্তি নির্ধারণ করার জন্য। জেলার রাজস্ব আদায়কারী বা কালেক্টর ও এই কাজ করতে পারবে।

৫. এই বিলে আছে, যে কমিটি হবে তাতে থাকবে সাংসদ, বিধায়ক, প্রাক্তন বিচারক এবং সমাজের কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এরা মুসলমান না হলেও হবে। তবে মুসলমান পক্ষের দু'জন মহিলাও থাকবে।

৬. একটা নির্বাচন পদ্ধতি থাকবে যেখানে থাকবে একজন করে দুজন ব্যক্তি মুসলিম ইলেক্টোরাল কমিটি থেকে, সাংসদ, বিধায়ক এমএলসি, রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য এবং দু'জন মহিলা সদস্য।

৭. ট্রাইব্যুনালের রায় ফাইনাল হবে। কোনো আপিল গ্রাহ্য হবে না কোনো কোর্টে। হাইকোর্ট মনে করলে হস্তক্ষেপ করতে পারে নিজের থেকে বোর্ডের আবেদনের ভিত্তিতে অথবা কোনো বিরুদ্ধ ব্যক্তির আবেদনে।

৮. বিল অধিকার দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে : কোনো অধিনিয়ম করার জন্য, রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের, ওয়াকফের হিসাব প্রকাশনা, ওয়াকফ বোর্ডের পরিচালনগত বিষয় প্রকাশনার জন্য। রাজ্য সরকার ওয়াকফের হিসাব অডিট করাতে পারে বা কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাগকে দিয়ে অডিট করাতে পারে। এই বিল অনুমতি দিচ্ছে আলাদা বোর্ড গঠনের আগাখানি এবং বোহরাদের জন্য।

এই ওয়াকফ বোর্ড যে অন্যায় ভাবে যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করেছে সেই সম্পত্তির মোট আর্থিক মূল্য ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা বলে তার রিপোর্টে ২০১১ সালে 'Shashvat Committee' জানিয়ে ছিল। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৯.৪ লক্ষ একর জমিতে। যা ভারতের মোট জমির মধ্যে মালিকানার ভিত্তিতে তৃতীয় সর্বোচ্চ। আগের সরকার ও বর্তমানের বিরোধী ইন্ডি জোট যে ভারতের হিন্দুদের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ তা এই তথ্য থেকেই বোঝা যায়। কেন তারা এই সংশোধনী বিলের সমালোচনা বা বিরোধিতা করছে তাও পরিষ্কার। মমতা সরকার এই ব্যাপারে এখন চুপ কেন বঙ্গবাসী যদি এখনো না বোঝে তাহলে আরেকটা ১৯৪৬-এর দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত থাকুক।

এদের আমলে ১৯৯৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস A.S. Anand and V.N. Khare-র ডিভিশন বেঞ্চ অর্ডার দিয়েছিল 'Sayyad Ali and others vs. Andhra Prodesh Waqf Board'-এর মামলায় যে সমস্ত সম্পত্তি যা ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে আছে তা থাকবে। কলেজিয়াম পদ্ধতিতে বিচারপতি নিয়োগ অব্যাহত থাকলে হয়তো আগামীদিনেও এই ধরনের রায় দান চলবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যে কোনো ওয়াকফ বোর্ডকে বরখাস্ত বা পুনর্নির্মাণ করতে পারে, যা এই বিলে আছে। ২৪ মার্চ ২০২৪-এ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, আদালত মনে করলে ওয়াকফ বোর্ডের আদেশকে সুবিবেচনা বা স্ক্রুটিনি করতে পারবে বা পরিবর্তন করতে পারবে যদি দেখাযায় সেটা আইন বিরুদ্ধ। এই বিল দেশের পক্ষে, সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় যা আগের কোনো সরকার বিল এনে এই কাজ করতে পারেনি।

এই ওয়াকফ বোর্ডের আদেশ আদালতে গ্রাহ্য হবে, যা আগে ছিল না। এই বিলে মুসলমান মহিলারা, পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মুসলমানরা, যাদের এতদিন বঞ্চিত করে তাদেরই একটা গোষ্ঠী ফুলে ফেঁপে উঠেছিল আর ভারত ভাগের চেষ্টা করছিল তাদের ও তাদের রাজনৈতিক নেতাদের গায়ে ফোস্কা তো পড়বেই। কিন্তু দেশের স্বার্থে এই বিল পাশ হওয়া ভীষণ জরুরি। এমন অনেক মৌলবি বা নেতা আছেন যারা ওয়াকফের সম্পত্তি কেনা-বেচা করেছে নিজেদের স্বার্থে যা ওয়াকফ নিয়ম অনুযায়ী অনুচিত বা অন্যায়। এখন ধরা পড়ার ভয়ে তারা এর বিরোধিতায় নেমেছে।

(লেখক আইনজীবী)

"এমন অনেক মৌলবি বা নেতা আছেন যারা ওয়াকফের সম্পত্তি কেনা-বেচা করেছেন নিজেদের স্বার্থে যা ওয়াকফ নিয়ম অনুযায়ী অনুচিত বা অন্যায়। এখন ধরা পড়ার ভয়ে তারা এর বিরোধিতায় নেমেছেন।"

বিচারবিভাগীয় অতিসক্রিয়তা : নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অধিকার খর্ব করা নয় কি?

বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা খারাপ নয়। কিন্তু নীতিনির্ধারণে বারবার হস্তক্ষেপ উদ্বেগের বিষয়।

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

বিগত কয়েক মাস যাবৎ ব্রাজিলের শীর্ষ আদালতের দাপুটে বিচারপতি আলেকজান্দ্রে ডি মোরেজ সে দেশে এক্স-এর সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে এক্স কর্প, স্পেস এক্স এবং টেসলার মালিক এলন মাস্ক খুব ঝামেলায় জড়িয়েছেন। অধুনা মোরেজ স্টারলিঙ্কের অ্যাকাউন্ট অ্যাটাচ করে এক্স-এর উপর আদালতের ধার্য জরিমানা দিতে বাধ্য করতে ব্রাজিলে তাদের সব লেন-দেন বন্ধ করে দিয়েছেন। ২০২৪-এ এপ্রিলে এটা শুরু হয় যখন মাস্ক এক্স-হ্যান্ডেলে তার সব অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করবেন বলার পর মোরেজ এই উদ্যোগপতির ব্যবসায়ে তদন্তের হুকুম দেন।

মাস্ক বলেন এটা সংবিধান-বিরোধী। মোরেজ বলেছিলেন যে এক ব্রাজিলীয় সেনেটের এক্স হ্যান্ডেল-সহ ৭টি এক্স হ্যান্ডেল বা ট্যুইটার ব্লক করতে না পারলে তাকে দৈনিক ১ লক্ষ রিয়াইজ বা ১৯৭৪০ মার্কিন ডলার জরিমানা দিতে হবে। দ্বন্দ্ব সেদিন থেকে চড়ছে। মোরেজ ব্রাজিলীয় রাষ্ট্রপতি ও বামপন্থী নেতা লুলা ডি'সিলভার ঘনিষ্ঠ। মাস্ক-মোরেজ দ্বন্দ্ব বিচারপতিদের অতি ক্ষমতাশালী হওয়া এবং বিচারালয়ের অতি-সক্রিয়তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। নির্বাচিত আইনসভার থেকে বিচারালয় বেশি শক্তিশালী হলে তার ফল কী হতে পারে? ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশেও রয়েছে একই রকমের ঝুঁকি। এটা ঘটে যখন আইনসভা বা নির্বাহী আধিকারিকদের কাজে সংবিধান-বহির্ভূতভাবে আদালত বা বিচারপতি হস্তক্ষেপ করেন। ভারতে এটা আকছার ঘটেছে, ঘটছে।

এবছর মার্চে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের আনা জনস্বার্থ মামলা শীর্ষ আদালত শুনতে রাজি হয়। ভূষণের দাবি হলো বিচারালয় শুধু বর্তমান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ খতিয়ে দেখবে না তারা একটি সাংবিধানিক সংস্থার নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও অংশগ্রহণ করবে। আবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে ভারতের প্রধান বিচারপতির বদলে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উচ্চস্তরীয় নিয়োগ কমিটিতে রেখে সান্ধু ও কুমারকে কীভাবে নিয়োগ করা হলো? শীর্ষ আদালত 'সামনেই নির্বাচন' বলে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করে।

কিন্তু আদৌ শীর্ষ আদালতের শুনানিতে রাজি হওয়াই তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ, কারণ তা সংবিধানে বর্ণিত ক্ষমতা পৃথকীকরণের ধারণার বিরুদ্ধে। শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখার নাম করে নির্বাচিত আইনসভার স্বেচ্ছাধিকারে নাক গলিয়েছিল।

২০২১-এর কৃষিবিল ও কৃষক বিক্ষোভের বিষয়ে শীর্ষ আদালত

২০২১-এ কৃষক আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্ৎসনা করা আদালতের অতি সক্রিয়তার নমুনা। শীর্ষ আদালত তিনটে কৃষি আইনের বাস্তবায়নে স্থগিতদেশ দেয় আইনের অন্য দিকগুলো উপেক্ষা করে। রেলপথ, টোলপ্লাজা ও রাজপথ আটকানো নিয়ে আদালত চুপ ছিল।

কয়েকটা কৃষক সংগঠন সরকারকে জানিয়েছিল যে কৃষি আইনগুলো নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা নেই এবং আইনগুলো প্রগতিশীল। সলিসিটর জেনারেল একথা জানালেও প্রধান বিচারপতি তাঁকে জানান এই কৃষি আইনগুলো যে ভালো সে কথা বলে কোনো আবেদন আদালত পায়নি। কৃষিবিল প্রত্যাহারের এক বছর বাদে আদালত নিযুক্ত কমিটি জানায় যে ৭৩টা কৃষক ইউনিয়নের মধ্যে ৬১টি এই বিলে সমর্থন দিয়েছিল।

নূপুর শর্মা মামলা

বিজেপি মুখপাত্র শ্রীমতী শর্মা জ্ঞানবাপী ধাঁচা বিষয়ে এক দূরদর্শন বিতর্কে তাঁর মন্তব্যের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে করা এফআইআর- গুলোকে একত্রিত করার আবেদন জানিয়েছিলেন। বিচারপতি সূর্যকান্ত নূপুর শর্মাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'তাঁর আলগা কথাবার্তা গোটা দেশে আগুন জ্বালিয়েছে। দেশে যা ঘটেছে তার জন্য তিনি নিজেই দায়ী'। কিন্তু মুসলমান জনতা দ্বারা নূপুরের গলা কাটার হুমকি দিয়ে দেশজুড়ে হিংসা চালানোর সমালোচনা করেননি তিনি। ২২ সালের মুসলমানদের ঘটানো সব দাঙ্গা ও তাণ্ডবের জন্য শ্রীমতী শর্মাকে দায়ী করলেও তসলিম রহমান নাসিরির হিন্দু দেবতাদের নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যকে তিনি উপেক্ষা করলেন। যে জেহাদি জনতা শ্রীমতী শর্মার গলা কাটার আহ্বান জানিয়েছিল এই মৌখিক পর্যবেক্ষণ তাদের বৈধতা দিয়েছিল।

সবরীমালা

২০১৮-এ শীর্ষ আদালত নির্দেশ জারি করে যে সব বয়সের মহিলাদের সবরীমালা মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। প্রধান বিচারপতি বলেন পুরুষের চেয়ে নারী কোনো অংশে হীন নয় আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো জৈব উপাদান নেই। বেঞ্চের ৪ জন বিচারপতি ঐকমত্যে এসেছিলেন, কেবল মহিলা বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা বিরুদ্ধ মতপ্রকাশ করেন। এই বিচারের ফলে কেরালা হিন্দু প্লেসেস অব পাবলিক ওয়ারশিপ (অথরাইজেশন অব এন্ট্রি) রুলস, ১৯৬৫-এর রুল ৩ (খ)-কে অমান্য করা হয়েছিল। এই রুলে ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। এটা স্পষ্টতই বিচারবিভাগের অতি সক্রিয়তা। আদালতের মামলার শুনানিতে রাজি হওয়াই উচিত হয়নি, কারণ ভগবান আয়াপ্পা একজন ব্রহ্মচারী এবং এটা হিন্দু ধর্মবিশ্বাস অনুসারে প্রার্থনাস্থল সংক্রান্ত তাদের এক অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত অনুশীলনের বিপরীতে যৌক্তিকতা ও সমানতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এই বিচারে। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এই প্রথাকে পিতৃতান্ত্রিকতার নিদর্শন বলতেও দ্বিধা করেননি। ভিন্নমত পোষণকারী বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা মতামত দিয়ে বলেছিলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে অযৌক্তিকতার কোনো স্থান নেই'।

দীপাবলীতে বাজি পোড়ানো

২০১৮ সালে কোনো আইনি ভিত্তি না থাকলেও সর্বোচ্চ আদালত দীপাবলীতে বাজি ফাটানোর জন্য দু' ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে পরিবেশ- অবান্ধব বাজি নিষিদ্ধ করেছিল। ২০১৯-এ দিল্লিতে একজনকে দণ্ডিত করা হয়েছিল দীপাবলীর রাতে ১০টার পরে বাজি ফাটানোয়। দণ্ডদান অতি সক্রিয়তা নয় কিন্তু এই বিধান জারি আদালতের অগ্রাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। যখন লক্ষ লক্ষ মামলা ঝুলে আছে তখন একজন সাধারণ মানুষকে শাস্তি দেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে গেল? আরও বেশি দরকারি মামলা ফেলে তারা খুচখাচ পিআইএল মামলার শুনানি করে। ১৯৯২ সালের আজমেড় ব্ল্যাকমেল ও গণধর্ষণের দোষীদের শাস্তি দিতে তিন দশক লেগে গেল, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

২০২৪-এর জুলাই মাসে উত্তরপ্রদেশ সরকার কাঁওড় যাত্রাপথে সব খাবারের দোকানে মালিকের নাম টাঙাতে বলে যাতে যাত্রীরা নিরামিষ খাবার পায়। মুসলমানরা হিন্দু দেব-দেবীর ছবি লাগিয়ে হিন্দু নাম দিয়ে দোকান খুলে আজেবাজে খাবার দেয় পরিচয় গোপন করে কাঁওড় যাত্রীদের। তড়িতে মুসলমানরা ও তাদের দরদিরা মাঠে নামে, সর্বোচ্চ আদালতে পৌঁছয়। ধর্মীয় বিশ্বাস, জনস্বাস্থ্য ও আইনশৃঙ্খলা প্রশাসনিক ব্যাপার। কিন্তু সেই বিষয়গুলি বিবেচনা না করে আদালত সেই আদেশ বাতিল করে।

১৯৯১ সালে বীরাস্বামী মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের বাড়তি স্বাধিকার দিলেও তা কার্যকর হলো না। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে মোদী সরকার ৯৯তম সংবিধান সংশোধন ও জাতীয় বিচারক নিযুক্তি আয়োগ বিল সংসদে পাশ করায় এবং জাতীয় বিচারক নিযুক্তি আয়োগ গঠন করে। এই প্রস্তাবিত সংস্থা বিচারকদের উচ্চতর আদালতে নিয়োগ ও বদলির দায়িত্বে থাকত। ২০১৫-র অক্টোবরে সর্বোচ্চ আদালত সেই বিল বাতিল করে, কারণ এটা নাকি সংবিধানসম্মত নয়। ২০১৯ সালে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক রঙ্গনাথ পাণ্ডে কলেজিয়াম প্রথা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লেখেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে বিচারক নিয়োগের একমাত্র নির্ণায়ক হচ্ছে জাত ও স্বজনপোষণ। বিচারক পরিবারের সদস্য হওয়াই এই জাত ও স্বজনপোষণ নিশ্চিত করে। এভাবে নিয়োগে বহু বিচারকের বিচারসংক্রান্ত দক্ষতা বা আইনের মৌলিক জ্ঞানও থাকে না। কলেজিয়াম প্রথায় পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ হয়।

রাজনীতিবিদদের তাদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা করতে হয় নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ে। কিন্তু বিচারকদের বেলায় তা বাদ। মোদী সরকার বিচারকদের সম্পত্তি ঘোষণা বাধ্যতামূলক করার বিল আনার কথা ভেবেছিল। শেষ খবর জানা নেই।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে আইনসভায়। কিন্তু প্রায়শ বিচারকরা আইনসভায় পাশ হওয়া আইন বাতিল করেন বা নীতিগত বিষয়ে নিজেদের হুকুম চাপিয়ে দেন। এর ফলে সংসদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। ১৯৭৩ কেশবানন্দ ভারতী মামলা এর নিখুঁত উদাহরণ। এখানে 'মৌলিক কাঠামো নীতি' স্থির হয় কোনো সংবিধান সংশোধন যদি সংবিধানের এই মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘন করে তা বাতিলযোগ্য। একনায়কতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদকে আটকাতে হলেও কিন্তু এটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার উপর কলেজিয়াম পদ্ধতিতে নিযুক্ত বিচারকদের অভূতপূর্ব ক্ষমতা অর্পণ করে।

ভারতে নির্বাহী, পরিষদীয় ও বিচার বিভাগীয় শাখার মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ক্ষমতা বণ্টন করা আছে। বিচার বিভাগ যখন তাদর আইনি কর্তৃত্ব অতিক্রম করে নীতি নির্ধারণ করে এবং নির্বাহীদের ক্ষমতা উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয় তখন ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিচারবিভাগের কাজ আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া। তার বদলে তারা প্রশাসকের ভূমিকা পালন করছেন। বিচারপতিরা নির্বাচনের মাধ্যমে আসেন না। তারা যদি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং সমাজের গুরুতর অংশকে ব্যাহত করে যেমন বাক্-স্বাধীনতা বা তার নিয়ন্ত্রণ, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তাতে 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভোটারদের কাছে উত্তরদায়ী' এই ধারণার অপলাপ করা হয়।

বিচারবিভাগ যদি কারও কাছে দায়বদ্ধ না হয় এবং অপরাজেয় হয়। তবে তাঁরা তাঁদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মতবিরোধকে চাপা দিতে পারেন, যে জনগণ বা সংগঠন সরকারের বা এমনকী বিচারবিভাগেরও বিরোধিতা করে তাকে নিশানা বানিয়ে। এমনই হয়েছে মাস্ক-মোরেজ দ্বন্দ্বে। বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা খারাপ নয়। কিন্তু নীতিনির্ধারণে বারবার হস্তক্ষেপ উদ্বেগের বিষয়। ওড়িশার সাংসদ সস্মিৎ পাত্র বলেছিলেন, 'শীর্ষ আদালতের কোনো পাঁচ-বিচারক বেঞ্চ কখনোই ১৪০ কোটি ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন না'। □

পরিবেশ সচেতনতায় সৃজার সৃজনশীলতা

সুতপা বসাক ভড়

পরিবেশ সচেতনতা সমগ্র বিশ্বের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা সারা বছর ধরে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা প্রকার কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। সেইসকল কর্মশালায় গুরুতর বিষয় আলোচনা হয়, সমস্যার সমাধানের জন্য ভাষাণাদি হয়, অথচ কর্মশালাগুলি বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়। ওই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি পরিবেশ দূষণ রোধ করতে বাস্তবিক অর্থে কতটা আগ্রহী, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। এইরকম পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের এক বিদ্যালয় পাঠরতা ছাত্রীর পরিবেশ দূষণ নিয়ে ভাবনা এবং তার সমাধানের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

তেলেঙ্গানা রাজ্যের ছাত্রী এ. সৃজা। একদিন সকালবেলা সে তাদের বিদ্যালয়ের গাছপালার পরিচর্যা করছিল। সেদিন হঠাৎ তার মাথায় এমন একটি চিন্তার উদয় হয়, সে লক্ষ্য করল, যে চারাগাছটি সে লাগাচ্ছে, সেটি একটি কালো রঙের প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। এমন অনেক প্লাস্টিক ব্যাগ আশপাশে পড়ে আছে। ১৪ বছরের ছাত্রী সৃজা তার হেড স্যারের কাছে যায় এই বিষয়ে আলোচনা করতে, তিনি তাদের বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক। সে হেড স্যারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায় যে, ছোটো ছোটো চারাগাছ রোপণ করার জন্য নার্সারিতে যে সব প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়, সেগুলি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে এই ধরনের প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। হেড স্যার সৃজার কথা মন দিয়ে শুনলেন। সৃজার বক্তব্য ছিল স্পষ্ট এবং এই সমস্যার সমাধান করাও অতি আবশ্যক। তখন থেকে একজন শিক্ষক ও ছাত্রী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক প্রয়াস শুরু করলেন।

তারপরই সৃজা নারকেলের খোলা দিয়ে 'বায়োপট' বানিয়ে ফেলে। নার্সারির লোকেরা তাতেই চারাগাছ তৈরি করতে শুরু করে। তার ফলে সেখানকার লোকজনের প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের মানসিকতা কম হয়েছে। ধীরে ধীরে 'বায়োপট'-এর ধারণা ওই অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তেলেঙ্গানা সরকারের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুজয় করমপুরী জানান, তিনি নিজেও এইরকম বায়োপট তৈরির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সৃজার উদ্ভাবনী শক্তি খুবই প্রশংসনীয়।

তেলেঙ্গানা সরকারের চা-বাগান সমিতির লোকেদের মধ্যেও সৃজা তার তৈরি বায়োপটের প্রচলন করে। সৃজা ও তার মাস্টারমশাই অনেকবার সেখানে গেছেন এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কীভাবে ওই বায়োপট তৈরি হবে। করমপুরী জানান, এক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল এবং সেগুলির অনুপাত সঠিক হওয়া খুবই প্রয়োজন, কারণ তবেই বায়োপটের উদ্দেশ্য সফল হবে।

২১ মাসের অবিরাম প্রচেষ্টার পর সৃজা তার মাস্টারমশাইকে জানায় তার সাফল্যের কথা। সে পেটেন্টের জন্যও আবেদন করেছে। 'সৃজা গ্রিন গ্যালাক্সি' নামে একটি সংস্থান রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় উপনীত হলে, সৃজা হবে সেখানকার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রথম সিইও। টি-ওয়ার্কাস-এর পক্ষ থেকে সৃজার মতামত নিয়ে একটি যন্ত্র বানানো হয়েছে, যেটি মাসে দশ হাজার বায়োপট তৈরির ক্ষমতা রাখে।

সৃজার সৃজনশীলতাকে সম্মান জানিয়ে শিল্প জগতের কয়েকটি কোম্পানি তার যোগাযোগ করে। G.E. Appliances নামক একটি কোম্পানি বায়োপ্রেসের সকল ব্যয় বহন করার দায়িত্ব নিয়েছে এবং সৃজার জন্য একটি উৎপাদন ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সৃজা জানায়, প্রথমে তার বাড়ির লোকজন ভেবেছিল— এটি তার খেলা, পরবর্তীকালে তারা এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। তাদের একটি ছোটো জমি আছে, সেখানে তুলো চাষ করা হয়। তারাও তুলোচারার জন্য এই বায়োপট ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

সিএসআইআর-এর পক্ষ থেকে সৃজাকে পুরস্কৃত করা হয়। নার্সারিতে যেসকল প্লাস্টিক ব্যাগ চা-গাছের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলি ওজনে ১৩-২০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোটি কোটি চারাগাছ এইভাবেই প্রস্তুত হলে, কত পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যবহার হয়, তা সত্যই চিন্তার বিষয়। কোনো বড়ো শহরে বিক্রির ব্যবস্থা করতে চায় সৃজা। এছাড়া অন্য কেউ বানাতে চাইলেও সৃজা তাকে ন্যূনতম মূল্যে বায়োপট বানাবার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে। এভাবে তার এই সবুজায়নের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়ে চলেছে। সৃজার কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়ে আমরা সকলেই পরিবেশ রক্ষার্থে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লেগে যাব। পরিবেশ, প্রকৃতি আমাদের মাতৃস্বরূপা, তাঁকে রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

লিভার নষ্টের জন্য দায়ী যে কয়েকটি বাজে অভ্যাস

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমাদের দেহের প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে লিভার অন্যতম। দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপ পরিচালনায় লিভারের সুস্থতা অনেক জরুরি। সে হিসেবে আমাদের দেহের সুস্থতা নির্ভর করে লিভারের উপরেই।

সুস্থ লিভার

অসুস্থ লিভার

কিন্তু আমাদের কিছু বাজে অভ্যাসের কারণে প্রতিনিয়ত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে লিভার। এরই ফলে লিভার খারাপের মতো মারাত্মক সমস্যায় ভুগতে দেখা যায় অনেককেই। অনেকে জেনে বুঝে, আবার অনেকে না জেনে কিছু বাজে কাজের মাধ্যমে দেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই অঙ্গটি নষ্ট করে ফেলছেন ধীরে ধীরে। যেমন :

১. অনেক দেরি করে ঘুমতে যাওয়া এবং অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠা দুটোই লিভার নষ্টের মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়। কারণ এতে শারীরিক চক্রের সম্পূর্ণ উলটোটা ঘটতে থাকে। যার মারাত্মক বাজে প্রভাব পড়ে লিভারের উপর।

২. অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠার আলসেমিতে প্রস্রাবের বেগ হলেও বাথরুমে যান না। চেপে শুয়েই থাকেন। এতে লিভারের উপরে চাপ পড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে লিভার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

৩. অতিরিক্ত বেশি খাওয়াদাওয়া করা লিভারের জন্য ক্ষতিকর একটি অভ্যাস। অনেকেই রয়েছে অনেকটা সময় না খেয়ে একেবারে অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন। এতে করে হুট করে লিভারের উপরে চাপ বেশি পড়ে যায়, যার ফলে লিভার খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪. সকালের খাবার না খাওয়া লিভার নষ্টের আরেকটি মূল কারণ। অনেকটা সময় পেট খালি থাকার কারণে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাশাপাশি খাদ্যের অভাবে কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে লিভারও।

৫. অনেক বেশি ওষুধ সেবন করা। বিশেষ করে ব্যথানাশক ওষুধ অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার প্রভাব পড়তে থাকে লিভারের কর্মক্ষমতার উপরে। এছাড়া ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেও ক্ষতি হয় লিভারের। এতে করে লিভার খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

৬. কেমিক্যাল সমৃদ্ধ যে কোনো কিছুই লিভারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু আলসেমি ও মুখের স্বাদের জন্য আমরা অনেকেই প্রিজারভেটিভ খাবার, অ্যার্টিফিশিয়াল ফুড কালার, অ্যার্টফিশিয়াল চিনি ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলি যা লিভার নষ্টের অন্যতম কারণ।

৭. খাবার তেল ও অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার লিভারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একই তেলে বারবার ভাজা খাবার বা পোড়া তেলের খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়া হলে লিভার তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে।

৮. অতিরিক্ত কাঁচা খাবার খাওয়াও লিভারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যেমন আপনি যদি খুব বেশি কাঁচা ফলমূল বা সবজি খেতে থাকেন তাহলে তা হজমের জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হয় পরিবাকতন্ত্রকে। এর প্রভাব পড়ে লিভারের উপরেও। সুতরাং অতিরিক্ত খাবেন না।

৯. অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্য পান লিভার নষ্টের আরেকটি মূল কারণ। অ্যালকোহলের ক্ষতিকর উপাদান সমূহ লিভারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

তাই লিভার ঠিক রাখতে হলে এই বাজে অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ভাগ্যনগরে অনুষ্ঠিত লোকমন্থন-২০২৪

গত ২১ থেকে২৪ নভেম্বর ভাগ্যনগরে অনুষ্ঠিত হলো লোকমন্থন-২০২৪। এটি হলো প্রবুদ্ধ বর্গ, লেখক, সাহিত্যিক, কলাকুশলীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয়স্তরের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের মহামহিম রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি, ২টি রাজ্যের রাজ্যপাল, ৩ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ১টি রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী, ৫ জন রাজ্যের মন্ত্রী, ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য,পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত জ্ঞানীগুণীজন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পূর্ণ তিনদিন সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহনরাও ভাগবত। রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখেন সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহনরাও ভাগবত।

এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও অন্যান্য ১২টি দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল মোট ১৫৬৮ জন। পূর্বক্ষেত্রের ওড়িশা থেকে ২০ জন কলাকুশলী ও ৩১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকে ২০ জন, মধ্যবঙ্গ থেকে ৪৬ জন এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে ১৯ জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের মোট ৭৩ জনের মধ্যে ১১ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সুসজ্জিত পরিসরে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমস্ত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ৩৭টি প্যাভিলিয়নে একই সঙ্গে লোক সংস্কৃতি, কলা প্রদর্শনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলতে থাকে। যা দেখবার জন্য প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার মানুষ উপস্থিত হন।

চাঁচলে সামাজিক সমরসতা মঞ্চের উদ্যোগে ভারতীয় সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ নভেম্বর উত্তর মালদহ সামাজিক সমরসতা মঞ্চের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'ভারতীয় সংবিধান দিবস' উদ্‌যাপিত হয় চাঁচল সঙ্ঘ কার্যালয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক দেবব্রত কুমার দাস, মালদহ বিভাগ প্রচারক অধীন কুমার সিংহ, উত্তর মালদহ জেলা প্রচারক ধনঞ্জয় সরকার, প্রবীণ প্রচারক জয়দেব দাস এবং মালদহ বিভাগ সহ-কার্যবাহ শুভাশিস প্রামাণিক। পুষ্পাঞ্জলি, পরিচয়পর্ব এবং সমবেত গীতের পর অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সামাজিক সমরসতা মঞ্চের উত্তর মালদহ জেলার সংযোজক তারাপদ মণ্ডল। তাঁর বক্তব্যের পর সভায় উপস্থিত নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয় সংবিধান বিষয়ক চর্চা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সামাজিক সমরসতা মঞ্চের সহ-বিভাগ সংযোজক দীপক চট্টোপাধ্যায়। দেড় ঘণ্টা ধরে আলোচনাপর্ব চলার পর শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বড়বাজার পুস্তকালয়ের উদ্যোগে সর্বসমাজ প্রতিনিধি সভা

গত ২৪ নভেম্বর বড়বাজার পুস্তকালয়ে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী মূলত মল্লিক সমাজ (ডোম) দ্বারা আয়োজিত এই সভাতে বিভিন্ন অনুসূচিত জাতির প্রমুখ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দেশ ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে বক্তব্য ও আলোচনা হয়। সভার প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন একল অভিযানের প্রমুখ কার্যকর্তা তথা কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌতম সরকার এবং ডোম সমাজের প্রতিনিধি কালীচরণ মল্লিক।

মালদহে সংস্কার ভারতীর বিজয়া- দীপাবলি সম্মেলন

গত ২২ নভেম্বর মালদহ টাউল হলে বিজয়া ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতী মালদহ জেলা ও মালদহ নগর চর্চাকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ ও শিল্পী সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস, জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা সম্পাদক তথা উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কিশোর কুমার সরকার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য প্রবীর কুমার মিত্র, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষিকা মিনতি দত্ত মিশ্র, বিশিষ্ট শিক্ষক সুনীল কুমার সরকার এবং বিশিষ্ট গম্ভীরা শিল্পী বাবলু মণ্ডল। সংগীত পরিবেশন করেন গাজোল চর্চাকেন্দ্রের পল্লবী ঘোষ। লক্ষ্মী সরকার, সুমিতা ভট্টচার্য, শুক্লা রায়, স্বাতী ঘোষ, ইন্দ্রাণী উপাধ্যায়, সুপ্রীতি হালদার, মানিক ঘোষ, ও সজল দত্ত। নৃত্য পরিবেশন করেন তুলি বিশ্বাস, সৌমি ঘোষ, শ্রেয়সী ঘোষ, অনুরূপা কর্মকার। সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে 'ছন্দ ভারতী নৃত্য অ্যাকাডেমির চোটো বড়ো শিল্পীরা। আবৃত্তি ও গানে ছিলেন কাকলি বিশ্বাস, বিনীত লাহা, নির্মাল্য দাস। শ্রুতি নাটক 'পাকা দেখা' মঞ্চস্থ করেন সোমেন সরকার ও দেবারতি দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৌশিক দাসবক্সী।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে বিজয়া-দীপাবলি মিলন অনুষ্ঠান

গত ২৪ নভেম্বর বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মধ্য কলকাতা জেলার বিজয়া ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে মিলনোৎসব। অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্মাননীয় অতিথিদের মঞ্চে আহ্বান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গৌড়ীয় মঠের প্রভু মুরারীপ্রসাদ মহারাজ। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক মানিকচন্দ্র পাল এবং পরিষদের মধ্য কলকাতার জেলা সভাপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী অনির্বাণ মিত্র। প্রদীপ প্রজ্বলন, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং তিনবার ওঙ্কারধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অতিথিদের সংবর্ধনার পর উদ্বোধনী স্তোত্র পাঠ করেন পরিষদের উত্তর কলকাতা বিভাগ সংগঠন সম্পাদক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। 'নাম-রামায়ণম্'-এর প্রথম দু'টি স্তবক পাঠ করেন তিনি। স্বাগত ভাষণ দান করেন পরিষদের মধ্য কলকাতা জেলার সভাপতি অনির্বাণ মিত্র। বক্তব্য রাখেন মঞ্চ সভাপতি পূজনীয় প্রভু মুরারীপ্রসাদ মহারাজ। ধর্মরক্ষার কাজে সমর্পিত সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-আদর্শ, পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচি, সামাজিক কাজ এবং সেবা কাজের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক মানিকচন্দ্র পাল এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের পরিষদের তরফে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ কমলেশ কুমার রাই, বর্ধমান কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান অরিজিৎ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদের প্রাক্তন উত্তর কলকাতা বিভাগ সংগঠন সম্পাদক, বর্তমানে সহ-প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, পরিষদের মধ্য কলকাতা জেলার বর্ষীয়ান কার্যকর্তা ও করসেবক সোমনাথ বসুকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি আবৃত্তি করেন মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটো ছোটো শিশুদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত নৃত্যানুষ্ঠান সকলের মন জয় করে। বহু মানুষের সমাগমে মিলন সভাঘরটি হয়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ। এরপর ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন পরিষদের মধ্য কলকাতা জেলা সম্পাদক সঞ্জীব দাস। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পরিষদের মধ্য কলকাতা জেলার সহ-সম্পাদক মানস সরখেল।

উলুবেড়িয়ায় আরোগ্য ভারতীর কর্মশালা

গত ১৬ ও ১৭ নভেম্বর উলুবেড়িয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে আরোগ্য ভারতী,দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় দু'দিনের এক কর্মশালা। কর্মশালার বিষয় ছিল— 'সুস্থ গ্রাম যোজনা'। কর্মশালায় উপস্থিত বিশিষ্ট জনের মধ্যে ছিলেন— আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য সদাশিবজী, পূর্বক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল, অখিল ভারতীয় কোষাধ্যক্ষ তপন বৈদ্য, পূর্বক্ষেত্র কার্যকারিণী সদস্য যুধিষ্ঠির নায়েক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সমিতি সহসচিব মোহন্ত ডাকুয়া, সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ড. অভিজিৎ ঘোষ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সভাপতি জয়ন্ত সেন

এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। দু'দিনের এই কর্মশালায় মোট ৭টি সত্র অনুষ্ঠিত হয়। ৫০ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা-সহ কর্মশালায় মোট ৫৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

পানাগড়ে সংস্কার ভারতীর

গত ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে শুরু হয় তিন দিন ব্যাপী 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)'-এর প্রশিক্ষণ বর্গ। বর্গে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর কার্যকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, অখিল ভারতীয় প্রশিক্ষণ বর্গ প্রমুখ অরুণ শর্মা, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি ড.সরূপপ্রসাদ ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি ও নাট্যশিল্পী কল্লোল ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত এবং

কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু।শুরুতে সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীত পরিবেশন করেন মিতালী ভট্টাচার্য। তারপর মঞ্চাসীন অধিকারীরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন নাট্যব্যক্তিত্ব কল্লোল ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''১৯৯৪ সালে আমরা নাটকের দল তৈরি করেছিলাম— 'এবং আমরা'। নাট্যচর্চার উদ্দেশ্য নিয়েই তেপান্তর নাট্যগ্রামের ভাবনা আসে। গ্রামের যুবকদের স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনা ও তাঁদের নাট্যচর্চার জন্য গড়ে তোলা হয় এই তেপান্তর নাট্যগ্রাম। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের চর্চা করছি আমরা নাটকের মাধ্যমে। আমাদের গ্রামে গড়ে তুলেছি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র 'ব্ল্যাকবক্স থিয়েটার', যেখানে দর্শক ও নাট্যশিল্পীদের নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তন করে নাটক করার ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য নাট্যমেলা করা প্রয়োজন বলেও আমরা মনে করি। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই 'গিরিশচন্দ্র নাট্যমেলা'র আয়োজন করা হয়েছে।''

এরপর বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়। তিনি বলেন, ''সঙ্ঘ এখন পাঁচটি বিষয় নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সামাজিক সমরসতা অর্থাৎ সমাজের মানুষের মধ্যে বিভেদের অবসান ঘটানো, কুটুম্ব প্রবোধন অর্থাৎ পরিবার রক্ষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা, পর্যাবরণ অর্থাৎ পশু-পাখিদের রক্ষা করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা, স্বাভিমান অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ রক্ষা করা এবং অনুশাসন অর্থাৎ নাগরিক কর্তব্যের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গঠন। যতদিন পর্যন্ত সমাজে সার্বিক সাম্যাবস্থা ও প্রাকৃতিক স্থিতিশীলতা না আসবে, ততদিন এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে কাজ করে যাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সংস্কার ভারতী তাদের কাজের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিক, সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমরা এই অনুরোধ করছি।''

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল বলেন, ''শিল্পীদের মধ্যে প্রথমে রাষ্ট্রভাব আনতে হবে। তাহলে তাঁদের কাজের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হবে। বিদেশি ভাবনার শিল্পকেও দেশীয় ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের এই সনাতন সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। বারবার আক্রান্ত হয়েও তা টিকে রয়েছে। আর তাই আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি বজায় রয়েছে। যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা কমে গিয়েছে, সেখানে শিল্পীরাও আক্রান্ত হয়েছেন। ইতিহাস বারবার সে সাক্ষী দিয়েছে।''

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, ''স্ব-ভাবের উপর আমাদের জোর দিতে হবে। সংগঠন, সদস্যতা, সংস্কার, সম্পর্ক, সম্মান প্রদান, সততা, সমালোচনা, স্বপ্ন, সময়ানুবর্তিতা, স্বচ্ছতা, সম্মেলন, সাম্য, সমর্পণ, সভা— এই ১৪টি বিষয়ের উপর জোর দিলে তবেই সংস্কার ভারতীর সার্বিক উন্নতি হবে বলে আমি মনে করি। শিল্পের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সাধনায় জোর দিতে হবে আমাদের। দেশ শক্তিশালী থাকলে তবেই আমাদের শিল্পের উন্নতি হবে। হানাদারদের হাত থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে হবে।''

সংস্কার ভারতী আয়োজিত এই তিনদিনের প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পারমিতা নিয়োগীর ভাবসংগীতের মধ্য দিয়ে। এরপর অখিল ভারতীয় প্রশিক্ষণ বর্গের প্রমুখ অরুণ শর্মা 'শিল্পী, সংগঠক

প্রশিক্ষণ বর্গ

ও কার্যকর্তার স্বরূপ'— এই বিষয় আধারিত মূল্যবান বৌদ্ধিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ''আমি খুবই আনন্দিত এই কারণে, কেন্দ্র থেকে সংস্কার ভারতীর যে নবীন কার্যযোজনা সূচি ঘোষিত হয়েছে, তা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত) সুন্দর ভাবে ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু করেছে। একজন কার্যকর্তার মধ্যে আগ্রহের সঙ্গে কাজ করার ভাবনা, সংকল্পের সঙ্গে কাজ করার দৃঢ়তা আবশ্যিক। কার্যকর্তাদের যেকোনো কাজ করতে হলে প্রথমেই সেই কাজের একটি চিত্র এঁকে নিয়ে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। প্রবীণ ও নবীন কার্যকর্তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য

হলো— মা ভারতীর আরাধনা। সংগঠনের বিস্তার করতে হলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচিতজনদের 'সংস্কার ভারতী' কী এবং সংস্কার ভারতীর মূল ভাবনা কী তা বোঝাতে হবে, তাদের সঙ্গে মনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সংগঠনের প্রতি নিজস্ব দায়িত্ব, সচেতনতা, দৃষ্টিকোণ সজাগ রাখতে হবে এবং মন-বুদ্ধি-বিচারের মধ্যে দিয়ে সংগঠনের প্রতি নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে।''

এরপর 'সামাজিক মাধ্যম ও সংস্কার ভারতী'— এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''সামাজিক মাধ্যমে কোনো বিষয়ের অপপ্রচার বন্ধ করতে এবং তার সঠিক প্রচারের জন্য একজন দক্ষ সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, যেকোনো সংবেদনশীল বা সুগ্রাহী করে তবেই প্রচার করতে হবে, যাতে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এছাড়া, সংগঠনের কার্যক্রম বেশি করে সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য সংগঠনের একটি ফেসবুক পেজ সকলের জন্য রাখতে হবে। ভালো বিষয়বস্তু তৈরি করে তার প্রচার, প্রসার, মূল্যায়ন করতে হবে এবং তার সমাজে প্রতিক্রিয়া কতটা হলো তা অনুধাবন করতে হবে।''

বিশিষ্ট সমাজসেবী মানস ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় এবং কেন আমরা উত্তরীয় ব্যবহার করি— এই সব বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানের অন্তিমলগ্নে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সভাপতি ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ তাঁর বক্তব্যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা পূজার সময় কেন আমরা তিনবার শঙ্খধ্বনি করি— এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে একমাত্র হিন্দুধর্ম ঠাকুর-ভগবান-ঈশ্বর— এই তিনটি শব্দের ধারাকে বিশ্বাস করে এবং এই তিনটি সূত্র ধরেই এই শঙ্খবাদনের মর্মার্থ। তাই আমাদের শাশ্বত, প্রাচীন সনাতন সংস্কৃতিকে রক্ষা করা আমাদের পরম কর্তব্য। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যে প্রগতিশীল ভাবনা ছিল তিনি তার সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে তনুশ্রী মল্লিকের নির্দেশনায় সমবেত সংগীত পরিবেশিত হয়। একক সংগীত পরিবেশন করেন রুমা মুখোপাধ্যায় ও অনিমা দাস মজুমদার। দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করেন অপর্ণা চক্রবর্তী ও ছায়া খাঁড়া। একক নৃত্য পরিবেশন করেন নরোত্তম সেনগুপ্ত। পরিশেষে সংস্কার ভারতীর কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য ধন্যবাদজ্ঞাপন এবং সংগীত প্রমুখ তনুশ্রী মল্লিকের রাষ্ট্রবন্দনা গীতের মধ্য দিয়ে তিনদিনের প্রশিক্ষণ বর্গের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

এই অনুষ্ঠানে 'ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস' কর্তৃক দুঃস্থ নাট্যশিল্পীদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ বর্গ সম্পর্কে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, ''সংস্কার ভারতী একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রতি বছরই সংগঠনের কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা করে ভারতীয় সংস্কৃতির মণিমাণিক্যগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অঙ্কন শিল্প, কাব্য, নাটক প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের মানুষরা পারদর্শী ছিলেন। ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সে কথা সুপ্ত রয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিধর্মীদের দ্বারা আমাদের দেশ বারবার আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে তারা ধ্বংস করতে পারেনি আর পারবেও না। সংস্কার ভারতী ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বের মানুষকে জানাতে চায়। আমরা সবাই সেই কাজে লিপ্ত রয়েছি। একদিন ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বের মানুষ পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।''

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে ফুটবল ও তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা

গত ১৬,১৭ নভেম্বর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বীরভূম জেলা সমিতি ও সিউড়ি নগর সমিতি এবং কামারডাঙ্গা নিউ মুন আদিবাসী ক্লাবের সহযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা ফুটবল ও তিরন্দাজি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ২০টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। পুরুষদের চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী হয় 'এমটি জুনিয়র বয়েজ দল' এবং মহিলাদের চূড়ান্ত পর্বেবিজয়ী হয় 'রাজনগর শ্রেয়া ইন্ডিয়া দল'।

তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় মোট ১৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ভলাই মুর্মু। অনুষ্ঠান শেষে কামারডাঙ্গা গ্রামের সোনার কাঠি শিশু শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে কামারডাঙ্গা নিউ মুন আদিবাসী ক্লাবের সহযোগিতা ছিল অভাবনীয়। এই ক্লাবের সহযোগিতায় ক্রীড়াবিদ, কার্যকর্তা ও গ্রামবাসীদের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দল ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার সঙ্গে প্রত্যেককে 'পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম'-এর নামাঙ্কিত জার্সি দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রান্ত প্রমুখ শ্রীরাম মুর্মু, বীরভূম জেলা সমিতি ও সিউড়ি নগর সমিতির মলয় চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দে, মাস্টার কিটু, বিশ্বনাথ দাস, শীতলপ্রসাদ মণ্ডল, সুদর্শন রায়, ভাস্কর মালী, কমল রোয়ানী, চণ্ডী মুর্মু, সোমনাথ ঘোষ, সুরজিৎ সাধু, সুব্রত সিনহা প্রমুখ কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার শুরুতে একাধিক ফুটবল (মহিলা ও পুরুষ) দলের সঙ্গে কার্যকর্তারা সনাতনী রীতিতে পরিচয়পর্ব সারেন এবং কল্যাণ আশ্রমের বহুমুখী সেবামূলক কাজ সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা হয়।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সংস্কার ভারতী ও সূত্রধরের যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ২৭ নভেম্বর সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ এবং সূত্রধর প্রকাশনীর যৌথ উদ্যোগে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে বাংলা ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ১৩৫ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এবং বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির ঘটনার প্রেক্ষিতে 'বঙ্গভাষার প্রতি' এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীতের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। তিনি বলেন, ভারত সরকার বাংলাভাষাকে ধ্রুপদী মর্যাদা দিয়ে বাংলাভাষীদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের দায়িত্ব নিয়ে সেই সম্মান বজায় রাখতে হবে। ড. কল্যাণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করা যায় না এমন অভিমত অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীচন্দ্র বসু প্রমুখ বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় জোর দিয়েছেন। আমাদের উচিত যথাযথ পরিভাষা তৈরি করে অন্যান্য ভাষার বইগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করা, যাতে বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রী বাংলাভাষায় যথাযথ শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাঙ্গালিয়ানা নিয়ে বলতে গিয়ে আমতা রামসদয় কলেজের অধ্যাপক ড. অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আজকে বাঙ্গালির ঘোর দুর্দিনে সুনীতি কুমারের মতো মানুষই আদর্শ দিশারির ভূমিকা নিতে পারেন। তিনি হিন্দুত্বের প্রশ্নে কখনো আপোশ করেননি। সুনীতি কুমারের তথাকথিত প্রগতিশীলদের প্রতি তীব্র বিরোধিতার কথাও ড. বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।

ড. আমিন বলেন, বাংলাভাষার ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ নিঃসন্দেহে বাংলাভাষার বিবর্তন, গত হাজার বছর ধরে বঙ্গসংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি এবং বাঙ্গালি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার পথ প্রশস্ত করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত কয়েক দশক ধরে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রকৃতি অবশ্যই চিরন্তন বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি চিরায়ত ও লোকায়ত বঙ্গসংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ও দিকচিহ্ন।

সূত্রধর প্রকাশনীর কর্মাধ্যক্ষ সুমন ভৌমিক বলেন, এই সভায় বাঙ্গালির নিজস্ব সত্তার সন্ধানে আমরা নিয়োজিত হতে চাই। বাংলা ভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার জড়বাদী প্রকরণ আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার এক অসৎ ক্রিয়ায় এই সমাজ মেতে উঠেছে, তার বিপ্রতীপে বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি— ত্রিবিধ জারণে আমরা জারিত হতে চাই। তাই এই ঘোর অসময়ে আমাদের এহেন সাংস্কৃতিক অভিপ্রয়াস।

সংস্কার ভারতীর প্রান্ত সভাপতি ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ বলেন, হিন্দু বাঙ্গালি নিজেরাই

বাংলাভাষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। শহরে বাঙ্গালির অধিকাংশ তাদের ছেলে-মেয়েদের বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন না। গ্রামের দিকেও তা দিন দিন বাড়ছে। আগে আমাদের নিজেদের সন্তানকে বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াতে হবে। নিজেরা সব জায়গায় বিশুদ্ধ ভাংলাভাষায় কথা বলতে হবে। তবেই বাংলাভাষা বেঁচে থাকবে। সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাহিত্য বিদা প্রমুখ মিলন খামারিয়া বলেন, সংস্কার ভারতীর সাহিত্য বিধা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সুনীতা রায় কর্মকার, অনিমা দাস মজুমদার এবং তনুশ্রী মল্লিক। পারমিতা নিয়োগীর নির্দেশনায় সমবেত সংগীত পরিবেশিত হয়। সূত্রধর প্রকাশনী দ্বারা প্রকাশিত তিনটি বই— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চা', সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস-সংস্কৃতি-শিল্প প্রসঙ্গে' এবং স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ সম্পাদিত 'বাংলাভাষার অনুষঙ্গে' উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সূত্রধরের কর্মাধ্যক্ষ সুমন ভৌমিক।

বনগাঁয় শিশু মন্দিরের কাজের শুভারম্ভ

রাষ্ট্রচেতনাসম্পন্ন মানুষদের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ হরিদেবপুর সংলগ্ন পঞ্চাননতলাতে শিশুশিক্ষার জন্য শিশু মন্দিরের কাজের শুভারম্ভ হয়েছে। উদ্যোক্তাদের কথায়, আবাসিক ও অনাবাসিক দুই ব্যবস্থাতেই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারবে। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ও বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বনগাঁ মহকুমা জুড়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ তাদের ছেলে-মেয়েকে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাতে ভর্তি করার জন্য ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। উদ্যোক্তাদের একজন জানান, আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠন শুরু করা যবে।

ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টার গত ২৩ নভেম্বর কলকাতার ভবানীপুরের আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে এক মনোজ্ঞ পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তুহিনা প্রকাশনীর

সহযোগিতায় আলাদা আলাদা পাঁচটি বইকে এক মলাটে ধরে সুধীর কুমার মিত্রের 'বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী' বইটি প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ও মুম্বাই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় জাদুঘরের প্রাক্তন অধিকর্তা শক্তিকালী বসু।

উদ্বোধনী সংগীত 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' পরিবেশন করেন গায়ক সুমন ভট্টাচার্য। এরপর ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের কার্যকরী সভাপতি প্রয়াত সুনীল দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন মনীষা রক্ষিত। প্রকাশিত বই সম্পর্কে আলোকপাত করেন সন্ধি মুখোপাধ্যায়। তিনি মধুরিমা সেনের গবেষণালব্ধ ৯২৮ জন নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীর উল্লেখ করেন। কালচারাল সেন্টারের সম্পাদক পল্লব মিত্র প্রকাশক হিমাংশু মাইতিকে কৃতজ্ঞতা জানান। হিমাংশুবাবুকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করে বিচারপতি চিত্ততোষবাবু বইটি প্রকাশ করেন। উল্লেখ, বঙ্গের ইতিহাসের অন্যতম স্রষ্টা ঐতিহাসিক সুধীর কুমার মিত্রের ৭৫ বছর আগে প্রকাশিত পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবীর পৃথক পৃথক পুস্তকের পুনঃপ্রকাশ হলো তুহিনা প্রকাশনীর সহযোগিতায়। ইতিহাসবিদ শুভেন্দু মজুমদার বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জীবনী আলোচনা করেন। সফিউন্নেসা আলোচনা করেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জীবনী। বেথুন কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. মমতা রায় বিপ্লবী বীণা দাসের বিপ্লবী জীবনের উল্লেখ করেন। রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী জীবন নিয়ে আলোচনা করেন শমীক স্বপন ঘোষ। বিপ্লবী বাঘাযতীন সম্পর্কে আলোকপাত করেন সর্বাণী মুখোপাধ্যায়। নেতাজী সম্পর্কে বলেন জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি নেতাজীর অন্তর্ধান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ড. কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কবিতা আবৃত্তি করেন। □

ধর্মজিজ্ঞাসা—কুড়ি

ভারতধর্ম : আত্মমুক্তি নয়—জগৎ কল্যাণ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ভারতধর্মের মূলকথা মিলন। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের। ভারতধর্মের লক্ষ্য মুক্তি। জন্মান্তরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে চিরবাঞ্ছিত, শাশ্বত, চিরশান্তির আধার ব্রহ্মে বিলীন হওয়া।

এই মিলন বা মুক্তির ইচ্ছা কিন্তু কোনো সময়েই আত্মকেন্দ্রিক নয়। ব্যষ্টির সাধনায় সমষ্টির মুক্তি এবং সকলের সঙ্গে মিলন হলো ভারত বা হিন্দুধর্মের সারকথা। পরদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা নয়, সকলের শ্রীবৃদ্ধি ও আত্মমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুক্তিই হলো ভারতধর্ম সাধনার মূলকথা। —সর্বেষাং মঙ্গলমস্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ —কেবল নিজের নয়, মঙ্গল হোক, শুভ হোক সকলের। সকলে থাকুক সুখে— নিরাময়ে।

ভারতধর্মের এই নিত্যদিনের প্রার্থনাই আরও বিশদ হয় তর্পণমন্ত্রে— আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত জগৎতৃপ্যন্তু। তৃপ্ত হোক এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলে। সকলের তৃপ্তিতেই ব্যক্তির তৃপ্তি। সমষ্টি সুখে না থাকলে সুখের অধিকারী হয়েও ব্যক্তি ভোগ করতে পারবে না তা শান্তিতে। সে কারণেই মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৬২/৯) বলা হয়েছে,— 'সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ। কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।। —কেবলমাত্র কল্যাণ কামনা করে বা ভালো ভালো কথা বা মিষ্টভাষণেই সকলের হিত বা মঙ্গল হবে না। কথা বা কামনার সঙ্গে সঙ্গে কায়িক শুশ্রূষা ইত্যাদিও করতে হবে। কথা ও কাজে হতে হবে এক ও আন্তরিক— তবেই সকলের মঙ্গল করা সম্ভব হবে।

বিষয়টি আরও বিশদ ভাবে শান্তিপর্বে বলা হয়েছে,— সর্বভূতাত্মভূতস্য সর্বভূতানি পশ্যতঃ (২৬২/৩২)— অর্থাৎ সকলের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। অন্য কোনো ব্যক্তি নয়, সেবা করছি নিজেকেই, এই বোধে আত্মস্থ হতে হবে। সমস্ত জীব বা সৃষ্টিতেই রয়েছি 'আমি'— এই বোধে ভাবিত হয়েই করতে হবে সেবা। আর সেইভাবে সেবা করতে পারলে পর-সেবা পরিণত হবে আত্ম-সেবায়। জীবসেবাই হয়ে শিবসেবা।

যখন সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্মকে দর্শনের বোধ জাগবে ব্যক্তির মনে তখনই তাঁর সেবা হবে সার্থক। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ এই কথাটিই বলেছেন বারে বারে। বলেছেন, 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন' (৬/৩২)। হে অর্জুন, সকলের মধ্যেই রয়েছি আমি— আমাকেই দর্শন করবে সকলের মধ্যে। তাহলেই দূর হবে মায়া, সব বিভ্রম। তাহলেই আমার সাযুজ্যলাভ করা হবে সহজ।

মনু সংহিতায় মনুও বলেছেন ওই একই কথা— 'সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।।' (১২/৯) সকলের মধ্যেই আত্মাকে সমভাবে দেখে এবং আত্মাতেই সর্বভূতের অবস্থিতির কথা জানার মধ্য দিয়েই ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়। সকলের মধ্যেই নিজেকে দেখার অনুভবেই মিলন ঘটে আত্মা ও পরমাত্মার। তখনই লয় হয় সব কামনার। তখনই ব্যক্তির হয় মোক্ষলাভ বা মুক্তি।

ভারতের ধর্মসংহিতা বা দর্শন গ্রন্থগুলিতেও কেবল এই কথাগুলিই বলা হয়নি, পুরাণকার ব্যাসও বিভিন্ন পুরাণ কাহিনির মাধ্যমে এই কথাই তুলে ধরেছেন নানা কাহিনি, ঘটনা বা জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যায় মহাভারতের দুটি ঘটনার কথা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসলেন পাণ্ডবরা। নানা যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করেও তাঁরা শান্তি পেলেন না। স্বজনহারানো শ্মশানের বুকে যে সুখসাম্রাজ্য

স্থাপন করা যায় না— এই উপলব্ধি তাঁদের মনে আনল বৈরাগ্য। তাঁরা তাই পার্থিব সুখ ও শান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পরমার্থের সন্ধানে মহাপ্রস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্তমতোই পৌত্র পরীক্ষিতকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হিমালয়ের পথ ধরেন মহাপ্রস্থানের উদ্দেশে। তাঁদের সেই যাত্রাপথে সঙ্গী হলো একটি কুকুর।

পাণ্ডবরা সকলেই কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের বাঞ্ছিত লোকে যেতে পারলেন না। সেই যাত্রাপথে একে একে দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব, অর্জুন ও ভীমের হলো পতন। তাঁদের প্রত্যেকের মনেই বাসা বেঁধেছিল যেসব অহমিকা ও ভ্রান্তি, তারই কারণে তাঁরা দেহ রাখলেন যাত্রাপথেই।

যুধিষ্ঠির তখন একবারে একা। নিঃসঙ্গ। প্রাণপ্রিয় জায়া ও ভাইদের হারিয়ে তিনি বুঝি-বা অবসন্নও। তাঁর সেই অবসাদের শীতল মুহূর্তকে কিন্তু উষ্ণ করে রেখেছিল যাত্রাপথের শুরুতেই সঙ্গ নেওয়া সেই সারমেয়। অবশেষে এক সময় শেষ হলো যাত্রা। স্বর্গদ্বারে স্বয়ং ইন্দ্র এলেন যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যার কামনায় তাঁদের এই মহাপ্রস্থান যাত্রা, তার দুয়ারে এমন স্বাগত আহ্বানে কিন্তু সাড়া দিলেন না যুধিষ্ঠির। বললেন, আমরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী যাত্রা করেছিলাম একমনা হয়ে— একই লক্ষ্যে, একই সাধনপথে। আজ তাদের বাদ দিয়ে আমি একা এই স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারব না। তারচেয়ে তারা যেখানে রয়েছে, আমাকেও বরং সেখানেই পাঠান। তাহলেই পাব শান্তি।

যুধিষ্ঠিরের কথায় ইন্দ্র হেসে বলেন, তুমি বৃথাই ভাবছ তাদের কথা। তাদের আমি আগেই এই স্বর্গে এনে রেখেছি। এবার এসো, তাদের সঙ্গে তোমার মিলনের সময় যে বয়ে যাচ্ছে। এসো আমার সঙ্গে। চার ভাই ও দ্রৌপদী আগেই স্বর্গবাসী হয়েছে শুনে আনন্দে ভরে গেল যুধিষ্ঠিরের মন। তাঁর সেই আনন্দের প্রকাশ দেখা গেল তাঁর সুস্মিত আননে।

সেটা দেখেই ইন্দ্র বলেন, আর দেরি কেন, এসো। একপা বুঝি এগোতে যান যুধিষ্ঠির, পরমুহূর্তেই পিছিয়ে যান। বলেন, কিন্তু আমি একা তো স্বর্গে যেতে পারি না— পারব না।

ইন্দ্র বলেন, তুমি এক কেন, তোমার স্ত্রী ও ভাইয়েরা যে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে— সেকথা তো বললাম তোমাকে।

হ্যাঁ, শুনেছি আমি। জেনেছি, তারা এখন স্বর্গবাসী। সেটা যে কত বড়ো আনন্দের বিষয় তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কিন্তু আমার সঙ্গে যে রয়েছে আমার এই পথ পরিক্রমায় এক সঙ্গী। তাকে ছাড়া তো যেতে পারব না স্বর্গে।

ইন্দ্র বলেন, কে তোমার সঙ্গী, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আর কাউকে?

যুধিষ্ঠির এবার সঙ্গী কুকুরটিকে দেখিয়ে বলেন, এই সারমেয়টি আমার সঙ্গ নিয়েছে একবারে যাত্রার শুরুতেই। তাই একে ছাড়া আমি একা স্বর্গবাসী হতে পারব না।

ইন্দ্র বলেন, কিন্তু একটা কুকুর কীভাবে স্বর্গে যাবে? না না, তা হতে পারে না। তুমি কুকুরটিকে ত্যাগ করে চলো আমার সঙ্গে।

যুধিষ্ঠির বলেন, তা হয় না। এই কুকুরের যদি স্বর্গে প্রবেশের অধিকার না থাকে, তাহলে আমিও যাব না স্বর্গে। আশ্রিত ও সঙ্গীকে ত্যাগ করে অমৃতলাভের অভিলাষী নই আমি। আমি বরং এখানেই থাকব। আপনাকে প্রণাম। আপনি এবার ফিরে যান।

আশ্রিত সঙ্গী এক কুকুরের জন্য যুধিষ্ঠিরের স্বর্গসুখ বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্তে প্রীত হলেন ইন্দ্র। ওদিকে অদৃশ্য সেই কুকুর। সে জায়গায় বিরাজমান স্বয়ং ধর্ম। তাঁরা দুজনেই বলেন, আমরা তোমাকে এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলাম। যুধিষ্ঠির, তুমি সঙ্গীকে ছাড়া স্বর্গসুখের অনীহা দেখিয়ে প্রকৃত ধর্মাচরণ করলে। ধর্মের প্রকৃত মর্মটি বুঝেছ, তুমি এবার এসো আমাদের সঙ্গে।

হৃষ্ট যুধিষ্ঠির। ধর্ম ও ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি প্রবেশ করলেন স্বর্গরাজ্যে। মিলিত হলেন ভাইদের ও দ্রৌপদীর সঙ্গে। সেই সঙ্গে, ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপটি অনুধাবনের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকলেন ইতিহাসে। যুধিষ্ঠির প্রমাণ করলেন, প্রকৃত ধার্মিক কখনই শরণাগত সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে না। আত্মসুখ যে প্রকৃত সুখ নয়, প্রকৃত সুখ যে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়, প্রকৃত সুখের জন্য যে সকলের সঙ্গে একাত্ম হতে হয় সেই মহাবাক্যটিই সূর্যসম উজ্জ্বল করে রাখলেন যুধিষ্ঠির। প্রমাণ করলেন, তিনি প্রকৃতই ধর্মরাজ।

যুধিষ্ঠিরের মতোই সূর্যবংশের রাজা হরিশ্চন্দ্রও একইভাবে ভারতবর্ষের প্রকৃত মর্মটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রাজা বা প্রতিটি সাধক যে প্রজা বা সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, তাঁদের সুখেই যে সুখী হন, নিজের সাধনার ফল যে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন, তাতেই প্রকৃত সুখ, শান্তি ও সাধনাতে যা পান, তা জানা যায় হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি অনুধাবন করলে।

হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ত্রেতা যুগের এক রাজা। রাজসূয় যজ্ঞের সময় শপথ নেন, কোনো ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে কিছু চাইলে অপূর্ণ রাখবেন না তা। তারপর বিভিন্ন ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে ঋষি বিশ্বমিত্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে হরিশ্চন্দ্রর রাজ্য প্রার্থনা করেন।

শপথ রাখতে হরিশ্চন্দ্র তাঁর রাজ্য দান করেন বিশ্বামিত্রকে। দান নিয়ে বিশ্বামিত্র বলেন, দক্ষিণা না দিলে দান অসম্পূর্ণ থাকে এবং দাতাকেও হতে হয় নরকবাসী।

হরিশ্চন্দ্র রাজকোষ থেকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে গেলে বিশ্বামিত্র বাধা দিয়ে বলেন, রাজ্যতো তাঁকে দান করা হয়েছে। তাই রাজকোষে কেন, কোনো কিছুতেই এমনকী ওই রাজ্যে বাস করারও অধিকার নেই তাঁর।

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দানের জন্য কিছু সময় চেয়ে কাশীতে চলে যান। ঘটনাক্রমে সেখানে তিনি স্ত্রী শৈব্যা এবং বালক পুত্র রোহিতাশ্বকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রি করেন। কিন্তু সে অর্থেও তুষ্ট হন না বিশ্বামিত্র। আরও অর্থ চান তিনি। বাধ্য হয়ে হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রি করার কথা ঘোষণা করেন। স্বয়ং ধর্ম সেসময় চণ্ডালবেশে তাঁকে কিনে নিয়ে শ্মশানে দাহকার্য ও কর আদায়ের দায়িত্ব দেন।

নানা ঘটনার মধ্যে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হলে তাকে দাহ করার

জন্য শৈব্যা শ্মশানে আসেন। চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র কিন্তু কর ছাড়া শৈব্যাকে সন্তান দাহ করতে রাজি হন। এবার কিছুটা দৈবী মায়াতে শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র পরস্পরকে চিনতে পেরে, সন্তান-সহ আত্মাহুতি দিতে যান। সেসময় চণ্ডালরূপী ধর্ম এবং ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র বলেন, তাঁরা হরিশ্চন্দ্রের সত্য, ন্যায় ও দাননিষ্ঠা পরীক্ষার জন্যই এই ছদ্মনাটকের অবতারণা করেছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন রাজা। তাই তাঁদের মুক্ত করে রাজ্য ফিরিয়ে দেন তাঁরা। সেইসঙ্গে বর দেন, স্ত্রীপুত্র-সহ হরিশ্চন্দ্র হবেন স্বর্গবাসী।

হরিশ্চন্দ্র কিন্তু সে বর নিতে রাজি হন না, বলেন, প্রজারা তাঁর সন্তান। তাদের ছেড়ে স্বর্গবাসী হবেন না তিনি। এরপর আরও কিছু ঘটনার পর রোহিতাশ্বকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা নিজেদের পুণ্যের ফল প্রজাদের ভাগ করে দিয়ে ইচ্ছুক প্রজাদের নিয়ে স্বর্গে বাস করতে থাকেন।

তারপরও আছে আরও কিছু ঘটনা, সেসব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। তাই এসব বাদ দিয়ে আসা যাক মূলপ্রসঙ্গে। প্রকৃত অর্থে উপরের ওই দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতধর্মের দুটি আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। সে কারণে সেই বৈশিষ্ট্যেরই বিশদে যাওয়া দরকার। হাঁটা যাক এবার সেই দরকারের পথে।

বিভিন্ন আলোচনার সূত্রেই আমরা জেনেছি, ভারত-সাধকের মূল লক্ষ্য আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভ। সেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার পরই কিন্তু সাধক মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন না।

সনাতন ধারায় সন্ন্যাসীর দুটি মূল বিভাগ— কুটীচক ও বহূদক। প্রথম বিভাগের সন্ন্যাসীরা কোনো নির্জন জায়গায় আশ্রম গড়ে সাধনা করেন, ভিক্ষান্নেই জীবন নির্বাহ করেন তাঁরা, বহূদক সন্ন্যাসীরা কিন্তু কোনো একটি জায়গায় স্থির থাকেন না। এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে বা এক পুণ্য স্থান থেকে আরেক পুণ্যস্থানে ঘুরে বেড়ান। তাঁরাও জীবন নির্বাহ করেন ভিক্ষান্নেই। এই দুই বিভাগের সন্ন্যাসীরাই প্রকৃতিতে কর্মসন্ন্যাসী। কর্ম তাঁদের জীবনের অন্যতম সাধনা।

কুটীচক ও বহূদক— দুই বিভাগের সন্ন্যাসীরাই কিন্তু সাধন পথে সিদ্ধ হয়েও সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি বা মোক্ষ চান না। তার অন্যতম কারণ— তাঁদের সাধনা কেবল আত্মমুক্তির জন্য নয়— একই সঙ্গে জগতের মুক্তি বা কল্যাণের জন্যও সচেষ্ট থাকেন তাঁরা। আর সেটা করার অন্য কুটীচকরা নির্জনে বসে জগতের কল্যাণের জন্য ধ্যান-প্রার্থনা চালিয়ে যান। তাঁদের সাধনার ধন তাঁরা ওই নির্জন জায়গা থেকেই আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেন। তারই মধ্য দিয়ে মানব হৃদয়ে আলোড়ন তোলেন তাঁরা এক অন্য বেতার তরঙ্গে।

অন্যদিকে বহূদক যাঁরা, তাঁরা ঘুরে ঘুরে উপদেশ দিয়ে, প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষের হৃদয়দেবতাকে জাগিয়ে তোলার এবং পরমের সন্ধান দেওয়ার কাজ চালিয়ে যান।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতের সাধনার লক্ষ্য দ্বিমুখী— নিজের মুক্তি বা মোক্ষ এবং সকলের মঙ্গল বা কল্যাণ।

ভারত-সাধনার এই দ্বিমুখী লক্ষ্যের কথাই ধ্বনিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অভীমন্ত্রে— আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। এই মন্ত্রে সহজ ভাষায় বলা হয়েছে, নিজের দেহে বা হৃদয়ে আত্মার উপস্থিতি অনুভব করার সময় থেকেই সাধকের সমস্ত কামনা-বাসনার শেকল ছিঁড়ে যায়। সাধকের জীবন্মুক্তি ঘটে। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না— কারণ একটাই, ব্রহ্ম যখন তাঁর হৃদয়ে রয়েছে, সেই রকম তিনি রয়েছেন সমস্ত জীবের মধ্যে। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষলাভ করতে হলে 'আমার মধ্যে যিনি, সকলের মধ্যেও তিনি' এই উপলব্ধিকে জাগ্রত করতে হবে সকলের মধ্যে। আর সেটা হলেই প্রশস্ত হয় মোক্ষলাভের পথ।

এই যে উপলব্ধি, তার সার কথা, কেবল নিজের মধ্যে নয়, সকলের মধ্যে সেই একের উপস্থিতি অনুভব করে সকলের মুক্তির জন্যই যখন ব্যক্তি সাধন তৎপর হয়ে ওঠেন তখনই আসে তাঁদের মোক্ষলাভের প্রকৃত সময়। সকলের মধ্যে ওই একত্বের বোধ জাগিয়ে তোলা এবং একইসঙ্গে সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়াটাই ভারতধর্মের বৈশিষ্ট্য।

কঠোপনিষদে এই কথাটিই বলা হয়েছে একটু বিশদে। কঠোপনিষদের উক্তি— একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেত্রেরেষাম্।। (২।২।১২) অর্থাৎ যিনি এক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, যিনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন, সেই পরমাত্মাকে যেসব জ্ঞানী মানুষ নিজের মধ্যে দেখেন বা তার উপস্থিতির কথা উপলব্ধি করেন, একমাত্র তিনিই শাশ্বত সুখের অধিকারী।

ভারতবর্ষ বা শাশ্বত ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ণকাম বা সিদ্ধ সাধকের কাছে মুক্তি এসে উপস্থিত হলেও তিনি কিন্তু বিশ্ববাসীকে পরিত্যাগ করে যেতে চান না। তাঁর দেহ ও স্বার্থবোধ দূর হয়েছে বলেই, তাঁর নিজের জন্য আর কিছু চাওয়ার নেই। বিশ্বকল্যাণই তখন তাঁর একমাত্র প্রার্থনা। তিনি তখন সর্বভূতে সেই একই ব্রহ্মকে দর্শন করেন। সেই দর্শনের অনুভূতিতে বিভোর হয়েই আদি শঙ্করাচার্য উদ্দীপ্ত কণ্ঠে অন্নপূর্ণাস্তোত্রমে উচ্চারণ করেছেন :

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।।

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কারণেই সাধক মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারেন, অনিমা ইত্যাদি আটরকম ঐশ্বর্যভুক্ত পরমা গতি অথবা মোক্ষ, কোনোটাই কামনা করি না। আমার বাসনা আমি যেন সকল প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের সমস্ত দুঃখ একা ভোগ করতে পারি আর তার ফলে যেন সমস্ত প্রাণী দুঃখ রহিত হয়।

সাধকের এই উপলব্ধিই ধ্বনিত রয়েছে চাণক্যের নীতিশ্লোকে— 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। অন্যের কল্যাণ, অন্যের সুখ কামনার কথা উচ্চারিত হয়েছে ঋগ্বেদেও একাধিকবার। কোথাও বলা হয়েছে, 'যে ধনবান পরকে প্রতিপালন করে না তাকে আমি ঘৃণা করি' (১।১২০।১২)। বেদমন্ত্রে ঋষি নিজের শরীর রক্ষার জন্য প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে কথায় মিষ্টতা দেওয়ার প্রার্থনা করেছেন। (২।২১।৬)। আর কিছু না হোক সকলকে মিষ্ট ভাষণে আপ্যায়িত করার এই কামনার পেছনেও রয়েছে, সর্বভূতে একের অবস্থানের উপলব্ধি।

বেদের ঋষিদের মন্ত্রে বারবার 'আমি' ও 'আমরা' কথা উচ্চারিত হওয়ায় অনেকে বেদকে কেবল স্বার্থপর বা 'দেহি দেহি'-র প্রার্থনায় ভরা বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু বেদে যে সর্বজনের জন্য বারবার এ জাতীয় প্রার্থনা জানানো হয়েছে তা থেকে গেছে তাদের দৃষ্টির আগোচরেই। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সংখ্যক সূক্তে বামদেব ঋষির প্রার্থনা— মধুমতীয়োষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্— ওষধীসমূহ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক, দ্যুলোক, জল, অন্তরিক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক। ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন...।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— পরহিত, জনকল্যাণ ও জীবসেবা। সে কারণে ভারতের সাধক দীপ্তকণ্ঠে বলতে পারেন,—'শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ/তীর্নাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাঽন্যানাপি তারয়ন্তঃ।। (শঙ্করাচার্যঃ বিবেক চূড়ামণি। ৩৭)— বসন্ত ঋতু যেমন কোনো ফলের আশা না করেই অযাচিত ভাবে পত্র-পুষ্প-ফলের বিচিত্র সম্ভারে জগতের তৃপ্তি সাধন করে, স্নিগ্ধচন্দ্রমা যেমন তৃপ্ত করে মার্তণ্ডতাপিত পৃথিবীকে, জীবন্মুক্ত পুরুষও সেইরকম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অপরের দুঃখমোচন, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য দেহধারণ করে সমস্ত জীবের সেবা করে যান।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের কল্যাণ ও মঙ্গল করাই ভারতধর্মের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যও। তাই তো বেদের ঋষি বলতে পারেন,—

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।
(ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৩-৪)

—তোমাদের মন্ত্র এক হোক, এক হোক মন-চিত্ত-সকলি। তোমাদের— সবকিছু এক হোক—সব মত-এক হোক।

এই জগৎকল্যাণ এবং জগতের হিত কামানাই হিন্দু ধর্মকে দিয়েছে এমন এক বিভা— যাতে উদ্ভাসিত এই বিশ্ব— বিশ্বের সব মানুষ। তাই ভারতধর্মের প্রার্থনা—

সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্‌বে ভ।।
ওঁ শান্তি শান্তিঃ শান্তি।।

ব্যক্তি নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের সব প্রাণীর এমনকী জড় পদার্থের কল্যাণ কামনা ভারতধর্মের মর্মবাণী নিজের মুক্তির চেয়েও অন্যর মুক্তি, সুখ, শান্তি ভারত-ঋষির কাছে অনেক কাঙ্ক্ষিত। □

বিচারবিভাগ হোক বা প্রশাসন, দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও আপোশহীন হলে প্রতিটি আইনের প্রকৃত প্রয়োগ সম্ভব— শ্রীঅভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের একজন ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের শুরু। চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণের পর একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির দায়িত্বগ্রহণ করেন। বিচারক-জীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা কেলেঙ্কারি, বিশেষত রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতির পর্দা উন্মোচনে তাঁর অবদান সর্বোচ্চ। বার বার রাজ্যের শাসকদলের রোষানলের সম্মুখীন হয়েছেন। গরিব বিচারপ্রার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন পরিত্রাতাস্বরূপ। বর্তমানে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে পালন করে চলেছেন দায়িত্ব। স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষে অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় আইনি পরিসরে তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ এবং রাজ্যের নানান বিষয়ে তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন।—স্বঃ সঃ

□ একজন প্রশাসনিক আধিকারিক হিসেবে আপনার কর্মজীবন শুরু। সেই অভিজ্ঞতা যদি একটু বলেন।

● ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশের পর আমাদের ব্যাচের অনেকেই আমরা বিভিন্ন ব্লক ভূমি রাজস্ব অফিসে রেভিনিউ অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলাম। সেই কাজের সূত্রে একবার একটি রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতা একটি লিস্ট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেই লিস্টে যাদের নাম রয়েছে তাদের জমির পাট্টা দিয়ে দিতে বলেন। ভূমিহীন কৃষকদের জমির পাট্টা দেওয়াই সরকারি নিয়ম। তার কথায় রাজি না হয়ে আমি সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করি। আমি সেই গ্রামে যাই এবং দেখি যে যাদের নাম ওই তালিকায় ছিল, তাদের অনেকেরই অনেকটা করে জমি রয়েছে। সেখানে প্রচুর লোকজন জড়ো হয়ে আমায় বলেন যে তাদের কোনো জমিজমা নেই। অথচ তাদের নাম সেই তালিকায় ছিল না। তাই এই পদ্ধতিতে পাট্টা বিলির ব্যবস্থায় আমি অসম্মত হই। পরে দেখলাম যে ব্লক ভূমি রাজস্ব আধিকারিক (বিএলএলআরও) পর্যন্ত ওই রাজনৈতিক নেতা পৌঁছে গিয়েছেন। সেই অফিসারও তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রয়েছেন। এরপর তো সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম। জানি না তারপর সেখানে আর কী কী ঘটেছে। রাজ্য প্রশাসনের কোনো শীর্ষস্তরে থাকলে এই ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতাম। এই ধরনের লোকজনের অপসারণ জরুরি।

□ কলকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজীবী এবং পরবর্তীকালে একজন বিচারপতি হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা যদি একটু বলেন।

● আইনজীবী হিসেবে কাজ করার সময়ে দেখেছি যে বিভিন্ন আদালতে পড়ে থাকা মামলার তালিকা খুবই দীর্ঘ। ধনী ব্যক্তিরা বড়ো বড়ো কাউন্সেল দাঁড় করিয়ে তাদের মামলা করিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যান, কিন্তু গরিব লোকজনের দায়ের করা মামলা পড়ে থাকে। তাদের মামলা শোনার কথা বিচারপতিরা ভাবেন না। অথচ সেই মামলাটির উপর হয়তো আবেদনকারীর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। বিচারপতি হিসেবে কাজ শুরুর পর আমার কোর্টে মামলার যে লিস্টটি ছিল, সেই লিস্টটিকে আমি তিন ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিই। এরফলে সেই লিস্টটির মাঝের বা শেষের দিকে নাম থাকা আবেদনকারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা পর্বের অবসান ঘটে। একটি লিস্টকে ভেঙে তিনটি লিস্ট তৈরি হওয়ার ফলে সপ্তাহে দু'দিন লিস্টের প্রথম দিকে যাদের নাম ছিল, তাদের মামলা শোনা হতো। লিস্টের মাঝামাঝি যারা ছিলেন তাদের মামলাও দু'দিন শোনা হতো। লিস্টের শেষে থাকা আবেদনকারীদের মামলা সপ্তাহে একদিন করে শোনা হতো। এর ফলে তালিকার প্রথমে, মাঝে ও শেষে থাকা আবেদনকারীদের সবাই শীঘ্র ন্যায়বিচার লাভের কমবেশি সমান সুযোগ পেতেন। আইনজীবী হিসেবে কাজ করার সময় বিচারবিভাগীয় দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টির একটি সম্ভাব্য সমাধান আমি ভেবেছিলাম। জজ হিসেবে কাজ করার সময় সেটা এইভাবে করেও দেখিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম যেহেতু মামলাগুলি দায়ের হয়েছে এবং আমার কাছে এসেছে, সেগুলি একদিন না একদিন তো শুনতেই হবে, আজ নয়তো কাল।

একদিন একজন ভদ্রমহিলাকে আমার কোর্টে বসে থাকতে দেখি। তাঁকে দেখেই মনে হয়েছিল যে তিনি একজন বিচারপ্রার্থী। তিনি কেন এসেছেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে তিনি একটি মামলা দায়ের করেছেন, কিন্তু কবে তার শুনানি সেই বিষয়ে জানেন না। আমি লিস্ট দেখে তাঁকে

জানাই যে আজ দুপুর দুটো থেকে আপনার কেস শোনা হবে। আপনি আপনার উকিলবাবুকে ডেকে নিয়ে আসুন। তাঁকে না পেলে আপনিও যদি বিষয়টা বলতে পারেন, তবে আমি দেখছি যে কী করতে পারি। শুনানির সময় তাঁর থেকে শুনলাম যে তিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা। বুঝতে পারলাম যে প্রধান শিক্ষিকা নিজের কাজটা না করে তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন। এটা এক ধরনের ব্যুরোক্র্যাটিক অ্যাটিচিউড। আমি নির্দেশ দিলাম যে প্রধান শিক্ষিকা যেন রাত বারোটার মধ্যে কাজটা করে দেন, নয়তো কাল সকালে যেন এজলাসে হাজিরা দেন। এছাড়াও আমার সময়ে কোর্টে বহু শিক্ষিকার ট্রান্সফারের (বদলির) আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।

□ এটা তো হলো মোশনের বিষয়। মেনশনের ক্ষেত্রে আপনি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

● মোশন (অর্থাৎ লিস্ট অনুযায়ী মামলা শুনানি)-এর আগে আমার কোর্টে নিয়মিত মেনশনিং হতো। মেনশনিঙের ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেক আইনজীবীর থেকে কোর্ট অফিসারের মাধ্যমে মেনশনিং স্লিপগুলি সংগ্রহ করতাম। শুনানি শেষ হলে প্রতিটি স্লিপে একটি করে সিরিয়াল নম্বর দিতাম। সেই নম্বর অনুযায়ী লিস্টে মামলাগুলি অন্তর্ভুক্ত হতো। আইনজীবী হিসেবে একবার দেখেছিলাম যে একজন বিচারপতির এজলাসে একজন কোর্ট অফিসার আইনজীবীদের থেকে মেনশনিং স্লিপগুলি নেওয়ার পর সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আমার এজলাসে এরকম ঘটনা কোনোদিনও ঘটেনি। প্রতিদিন সব কাজ শেষ করে অফিস থেকে বেরোতে রাত ৯টা-৯.৩০টা বাজতো।

□ শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির পর্দাফাঁসে আপনার ভূমিকা রাজ্যের মানুষ চিরদিন মনে রাখবে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির কাজকর্মে মনিটরিং, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কী ধরনের সমস্যা বা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই বিষয়টা যদি একটু বলেন।

● দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন সম্ভব নয়, কিন্তু দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই সম্ভব। কোনো প্রশাসক নিজে দুর্নীতিপরায়ণ হলে আইন অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হবেন, কিন্তু তিনি সঠিক পথে থাকলে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একেবারেই ঘাবড়াবেন না। বিচারবিভাগ হোক বা প্রশাসন, দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও আপোশহীন হলে প্রতিটি আইনের প্রকৃত প্রয়োগ সম্ভব। আইনের বইতে লিপিবদ্ধ প্রতিটি ধারার বাস্তবায়ন তাঁদের মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁদের হাতে ক্ষমতা দেওয়াই হয়েছে যাতে আইনের সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হয়।

বিচারবিভাগ কলোনিয়াল হ্যাংওভার বা ঔপনিবেশিক মানসিকতা হতে মুক্ত নয়। পরিতাপের বিষয় হলেও এটা সত্যি যে কতিপয় বিচারপতি হয়তো নিজেদের 'ব্রাউন সাহেব' মনে করেন। সাধারণ মানুষকে লিগাল রিলিফ বা ন্যায়বিচার দিতে তাদের সেভাবে তৎপর হতে দেখা যায় না। গরিবদের মামলার বিষয়ে তারা ভাবিত নন। শিক্ষা দপ্তর, এসএসসি-সংক্রান্ত বহু মামলা আমার এজলাসে এসেছিল। মামলাগুলি নিয়মিত শুনে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের নির্দেশ দিই। তাদের তদন্তের ক্ষেত্রে সময়ও বেঁধে দিই। সেই টাইম-বাউন্ড এনকোয়্যারির সুফল আবেদনকারীরা পেয়েছেন। হয়তো এই কারণেই ১৭ নম্বর কোর্টের (এই এজলাসে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বসতেন) নাম নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোনো মামলায় একশো পৃষ্ঠার রায় দেওয়াটা কোনো বিচারকের কৃতিত্ব হতে পারে না। অন্যায়ের শিকার সাধারণ মানুষকে দ্রুত ন্যায়বিচার দানই হওয়া উচিত বিচারপতিদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গজদন্তমিনারে বসে থাকার পরিবর্তে বিচারকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বেশি সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি।

□ অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চ বা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে রিলিফ পেয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দুর্নীতিতে কীভাবে লাগাম দেওয়া সম্ভব?

● রিলিফের মেরিট থাকলে রিলিফ পেলে সমস্যা নেই, কিন্তু কিছু বিচারপতি তাদের কর্মজীবনে ভয়ানক গর্হিত কিছু কাজ করেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। বিচারপতি সৌমেন সেন ও হরিশ ট্যান্ডন তাদের মধ্যে অন্যতম। এমনকী এই ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার জারি করে আমায় সুপ্রিম কোর্টে পাঠাতে হয়েছিল। একবার শুনানির সময় কিছু আইনজীবী পকেটে পেপার ওয়েট ইত্যাদি নিয়ে আমার এজলাসে ঢুকেছিলেন। তারা হয়তো আমায় আক্রমণ করতে পারতেন। সেই খবর পেয়ে সেদিন আমি আদালতের কাজকর্ম রেকর্ডিঙের নির্দেশ দিই। সেই নির্দেশে বিরক্ত হয়ে রাজ্য সরকারের একজন অ্যাডভোকেট জেনারেল আমায় বলেছিলেন যে আমার কোর্টে লাইভ স্ট্রিমিং হয় না কেন? তাঁকে আমি বলেছিলাম যে আমার কোর্ট হলো ওপেন কোর্ট। এই এজলাসে সবার ক্ষেত্রে সবসময়ের জন্য অবারিত দ্বার। যে কেউ এই কোর্টরুমে প্রবেশ করে আদালতের শুনানি দেখতে পারেন। শুনানির সময়েও আমার দৃষ্টি থাকে কোর্টে উপস্থিত সকলের প্রতি। আমি দেখি যে কারা চিন্তান্বিত মুখে বসে আছেন, কার মুখে ফুটে উঠছে উদ্বেগ, আর কে কে দাঁত বের করে হাসছেন। লাইভ স্ট্রিমিঙের প্রযুক্তি আসার আগে কি আদালতে বিচার প্রক্রিয়া হতো না? নাকি লাইভ স্ট্রিমিং না হলে আদালতের কাজকর্ম থেমে যাবে? আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর তার কাছে ছিল না।

□ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের শাসক দলের রোষানলে আপনি ছিলেন ও রয়েছেন। নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো শঙ্কা নেই তো?

● রাজ্যের শাসক দলের তরফে আমাকে আহ্বান জানানো হয়েছিল রাজনৈতিক ময়দানে আসার জন্য। তারা আমাকে বুঝে নেবেন। তাদের সেই চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভয় পেলে তো চলবে না। আমার সঙ্গে সিআইএসএফের কয়েকজন দক্ষ ও শক্তিশালী নিরাপত্তাকর্মী থাকেন।

আমার লোকসভা কেন্দ্রে একদিন কিছু মানুষের সঙ্গে আমার দেখা। তারা বললেন যে অন্য দল করলেও তারা আমায় শ্রদ্ধা-সম্মান করেন। মানুষের হৃদয় থেকে শাসক দল আমায় মুছে ফেলবে কীভাবে?

□ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনি তুলনামূলকভাবে একটু নবীন। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন আপনার দৃষ্টিতে কতটা কঠিন বা সহজ ছিল? পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সংগ্রামী, রাষ্ট্রবাদী মানুষদের উদ্দেশে স্বস্তিকার মাধ্যমে কোনো বার্তা দেবেন?

● পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষকে অশেষ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভেন্দু বাবুর জনপ্রিয়তা এবং কর্মীদের চোয়াল চাপা লড়াইয়ের ফলেই এই জয়। রাজনীতিতে যারা প্রবীণ তারা এই রাজ্যটিকে যেন একটি অচলায়তনস্বরূপ তাসের দেশে পরিণত করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে 'সবুজের অভিযান' কবিতায় লিখেছিলেন— 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' তাই তাদের থেকে নবীন হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি আমার যা করণীয় তা অবশ্যই করার চেষ্টা করছি এবং আগামীদিনেও তা অব্যাহত থাকবে।

আমায় ভোট না দেওয়ার জন্য শাসক দলের সন্ত্রাস চলেছিল গোটা তমলুক লোকসভা জুড়ে। বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের অনুদান

পাঠানো বন্ধ করে দেয় রাজ্য সরকার। এত কিছু সত্ত্বেও এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র হতেই আমি লিড পেয়েছি। একটি মুসলমান অধ্যুষিত বিধানসভা আসনেও আমি লিড পেয়েছি যা পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলকেও হয়তো হতবাক করেছে।

□ সাংসদ হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নে আপনার পরিকল্পনার বিষয়ে যদি একটু আলোকপাত করেন।

● সংসদে দাঁড়িয়ে কোয়েশ্চেন আওয়ারে নিজ লোকসভা কেন্দ্রের নানা বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলিতে গিয়ে মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বেশি জরুরি বলে আমি মনে করি। আমি নতুন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছি। হলদিয়া বন্দর এলাকায় এখনও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে থাকা অনেক জমি খালি রয়েছে। এই জমিগুলি ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগে নানা শিল্প স্থাপন সম্ভব বলে আমার ধারণা। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিরাট সংখ্যক মানুষ অনেক রকমের ক্যানসারে আক্রান্ত। এই গরিব ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসার জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল' থেকে অর্থসাহায্যের বিষয়টিও দেখতে হয়। প্রতি সপ্তাহে দু'দিন আমার লোকসভা কেন্দ্রে যাই। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই আমার কর্তব্য।

□ বর্তমানে একটি বিষয় জাতীয়স্তরে চর্চার কেন্দ্রে রয়েছে। তা হলো ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। যে আইনটি এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে, সেই আইনটিতে সংশোধনী কেন প্রয়োজনীয়— সেই সম্পর্কে যদি বলেন।

● ১৯৯৫ সালে এই ওয়াকফ আইনটি পাশ হয়, কিন্তু আইনটিতে অনেক সমস্যা রয়েছে। আমাদের আইন ব্যবস্থা অ্যাংলো-স্যাক্সন জুরিসপ্রুডেন্স আধারিত। সেই বিচারধারার সঙ্গে এই ধরনের আইন খাপ খায় না। ইসলামি দেশগুলির বাইরে অন্য দেশগুলিতে মহমেডান জুরিসপ্রুডেন্স কার্যকরী নয়। সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তাই এই দেশে এধরনের আইনের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। সংসদীয় কমিটিতে এই সংক্রান্ত সংশোধনী নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। সংসদের এই অধিবেশনে বা পরে কখনও বিলটি আসতে পারে।

□ অমুসলমানদের জায়গা-জমি, সম্পত্তি এই আইনের মাধ্যমে কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে দেশজুড়ে ক্ষোভ রয়েছে। আইনটিতে ন্যাচারাল জাস্টিসের (ন্যায়বিচারের) কোনো সংস্থান কি রয়েছে?

● আইনটি শরিয়ত প্রভাবিত। আইনি বিবাদ মেটানোর জন্য ট্রাইব্যুনাল ছিল। অ্যামেন্ডমেন্টে সেটি অ্যাবোলিশ হতে চলেছে (অর্থাৎ, এই সংশোধনীর মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার অবসান ঘটতে চলেছে)। সরাসরি বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে পারবেন সকলেই। পুরনো যে মামলাগুলি রয়েছে, তারাও নিশ্চিতভাবে আদালতের মাধ্যমেই বিচার পাবেন। এই আইনে যে কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ বলে ঘোষণা করা যেতে পারে, এছাড়াও এই আইনে রয়েছে আরেকটি সংস্থান। 'ওয়াকফ-আল-আল-আউলাদ'-এর প্রক্রিয়া অনুযায়ী কোনো মুসলমান ব্যক্তি তার পরিবার এবং তার উত্তরসূরীদের জন্য তার সম্পত্তিকে ওয়াকফ ঘোষণা করে যেতে পারেন। এই বিষয়গুলি 'ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট'-এর বিরোধী। ভারতে এভাবে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরিত হতে পারে না। কোনো রেজিস্টার্ড ডকুমেন্ট ছাড়া কাউকে কোনো স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া যায় না, বা কেউ কোনো স্থাবর সম্পত্তি দাবিও করতে পারেন না।

□ ওয়াকফ আইনের সংশোধনীর বিষয়ে মোল্লাবাদীদের তরফে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী দলগুলির তরফেও চলছে চরম বিরোধিতা। এই সংশোধনী পাশ হওয়া রুখতে বিরোধী দলগুলির এই ভয়ংকর ভূমিকার কারণ কী?

● যারা বিভিন্ন সম্পত্তিকে ওয়াকফ বানিয়ে ভোগদখল করছিলেন, তাদের স্বার্থে ঘা দিতে চলেছে এই বিল। এই সংশোধনীর ফলে মুসলমান মহিলা ও শিশু-সহ দরিদ্র মুসলমানরা উপকৃত হবেন। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের একজন এমপি ওয়াকফ সংক্রান্ত জেপিসি (যৌথ সংসদীয় কমিটি)-র বৈঠকে হইচই শুরু করেন। এরপর এই কমিটির চেয়ারম্যান ঘরে ঢুকে তাকে বলেন— 'আপ শান্তি সে ব্যাঠ যাইয়ে'। তাঁর কথা শুনে তিনি রেগে গিয়ে জল দেওয়া হয় যে কাচের বোতলগুলিতে, সেইরকম একটি বোতল চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। তাতে আবার তাঁরই আঙ্গুল কেটে যায়।

□ আপনাকেও উনি নানা কু'কথা বলে চলেন। ইদানীং বলেন যে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা করে দেখাক।

● উনি কি জানেন যে ইতিমধ্যে আমি সুপ্রিম কোর্টে ক'টা মামলা করেছি? আইনজীবী থাকাকালীন আমি যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়তাম সেটা হয়তো ওনার জানা নেই।

□ এক দেশ, এক নির্বাচন নিয়ে ভারত সরকারের তরফে জোর তৎপরতা চলছে। এই আইনি সংস্কারটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

● গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, কিন্তু সংসদের পাশাপাশি এই সংক্রান্ত সংশোধনীগুলি বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাতেও পাশ করাতে হবে। বহু রাজ্য সেই সংশোধনী পাশে নারাজ হতে পারে বলে আমার মত। এই বিষয়ে দেশজুড়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা বেশ কঠিন।

□ প্রতিবেশী বাংলাদেশে বাংলা ভাষা, বাঙ্গালি কৃষ্টি-সংস্কৃতির উপর যে ভয়ংকর আঘাত হানা চলছে, যেভাবে সেই দেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে সেই বিষয়ে এপারে কাউকে সরব হতে দেখা যায় না কেন?

● পশ্চিমবঙ্গ, গোটা ভারত-সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে বহু মানুষ এখন প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। সেই দেশে ঘটে চলা মর্মান্তিক ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে একজন বাঙ্গালি হিসেবে আমিও মর্মাহত। বাংলাদেশে যা যা ঘটছে, তার পিছনে একটা গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। সেই চক্রান্তের মোকাবিলা করাটা আগামীদিনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেই দেশের অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের পাশে আমরা রয়েছি।

□ পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে বোমা-বারুদ, হাতিয়ারের স্তূপ, ভয়াবহ নারী নির্যাতন— রাজ্যজুড়ে এক শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়ে স্বস্তিকার মাধ্যমে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে কোনো বার্তা দেবেন?

● রাজ্যে জেহাদি কার্যকলাপ, হিন্দুদের পূজাপার্বণে আক্রমণ, আগ্নেয়াস্ত্রের দাপাদাপি, নারী নির্যাতনের ঘটনায় শাসক দলের যোগের মতো বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। সংবিধানসম্মত উপায়ে কেন্দ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের ফলটা শেষ কথা নয়। নির্বাচনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে রাজ্যের শাসক দল আস্ফালন করছে। বাস্তবে তারা ভেতরে ভেতরে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শাসক দলের নানা দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

সাধারণ মানুষের সামনে সেগুলি তুলে ধরে আমরা আগামীদিনে রাজ্যব্যাপী জন-আন্দোলন গড়ে তুললে এই শাসক দল পালাতে পথ পাবে না। তবে নির্বাচনে সাফল্য লাভের জন্য শক্তিশালী বুথ ভিত্তিক সংগঠন জরুরি। □

মহিলা হকিতে এশিয়া সেরা ভারত

নিলয় সামন্ত

এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হলো ভারতীয় মহিলা হকি দল। গত ২০ নভেম্বর বিহারের রাজগীরে প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে ১-০ গোলে চীনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো ভারতীয় মহিলা দল। গোটা প্রতিযোগিতায় সব ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেল ভারত।

বিহারের রাজগীরে এই টুর্নামেন্টের টানা সব ম্যচে জয় পেল ভারতীয় মহিলা হকি দল। এর আগে গ্রুপ লিগের খেলায় চীনকে হারিয়েছিল ভারত। এই নিয়ে তৃতীয়বার এশিয়া সেরার খেতাব

ঘরে তুলল ভারতীয় দল। তৃতীয় কোয়ার্টারে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করলেন দীপিকা। যদিও ব্যবধান বৃদ্ধি করার সুযোগ হাতছাড়া করেন দীপিকা নিজেই। কারণ পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি দীপিকা নিজেই। অবশেষে তৃতীয় কোয়ার্টারে গোলকিপার লি টিঙের ডান দিক দিয়ে জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। এই নিয়ে ৭ ম্যাচে ১১টি গোল হলো তাঁর। কিছুক্ষণ পরেই ফের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসে ভারতের সামনে। তবে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন দীপিকা। গোটা ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে সে ভাবে আক্রমণ গড়ে তুলতে পারেনি চীনা দল। তাছাড়াও ভারতীয় দলের গোলকিপার বিচু দেবী বেশ কিছু ভালো সেভ করেন।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের লক্ষ্য ছিল খেতাব ধরে রাখা। প্রথম এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ হয়ে গোলশূন্য ভাবে। চারটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় ভারতীয় দল। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ৩১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল দীপিকা ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন। এরপর ভারতীয় দল একাধিক সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি, অন্যদিকে, চীন বেশ কয়েকবার আক্রমণ করলেও ভারতীয় দলের ডিফেন্স অটুট থাকে। এর আগে উইমেন্স এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে জায়গা পাকা করে নিলেন ভারতের মেয়েরা। সেমিফাইন্যালে ফের জাপানকে হারিয়ে দিল ভারতীয় মহিলা হকি দল। এবার ২-০ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল তারা। ভারতের হয়ে দুটো গোল করেন যথাক্রমে নভনীৎ কৌর ও লালরেমসিয়ামি।

খেলার শুরু থেকেই আগের দিনের মতোই জাপানের বক্সে বারবার হানা দিচ্ছিলেন ভারতের ফরোয়ার্ড লাইন। কিন্তু নভনীৎ ও সঙ্গীতার অ্যাটাককে বারবার পরাস্ত করে দিচ্ছিলেন জাপানের ডিফেন্স লাইন। বেশ কয়েকটি শট আটকেও দেন জাপানের গোলরক্ষক। মাঝমাঠেও বারবার জাপানের প্লেয়াররা নাকানিচোবানি খাচ্ছিলেন। কিন্তু তবুও শেষ মুহূর্তে গোলমুখ খুলতে পারছিলেন না কেউই। প্রথম কোয়ার্টারের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি কর্নারও পেয়েছিল ভারত। নভনীতের শট বারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। প্রথম তিনটি কোয়ার্টারে এরপর একাধিক সুযোগ তৈরি করেও গোলমুখ খুলতে পারেননি ভারতের মহিলা হকি দলের ফরোয়ার্ডরা।

শেষ পর্যন্ত চতুর্থ কোয়ার্টারে ৪৮ মিনিটের মাথায় ভারতের হয়ে প্রথম গোলটি করেন নভনীৎ কৌর। ট্যাপ করে জাপানের গোলরক্ষকে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে দেন নভনীৎ। খেলার শেষের চার মিনিট আগে আরও একটি গোল পেয়ে যায় ভারত। লালরেমশিয়ামিকে বল পাস দিয়েছিলেন সুনেলিতা। সেখান থেকেই গোল করে দেন লালরেমশিয়ামি।

এর আগে গ্রুপ পর্যায়ের খেলায় শেষ সময়েও জাপানের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত। সেদিনও শুরু থেকে ভারতের ফরোয়ার্ড লাইন বারবার বক্সে ঢোকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অর্ধে নভনীত ও দীপিকার সৌজন্যে তিনটি গোল করে ভারত নিজেদের জয় নিশ্চিত করে। এই ম্যাচে ভারতের হয়ে প্রথম গোল করেছিলেন নভনীত কৌর। তিনি ৩৭ মিনিটের মাথায় ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর দীপিকার জোড়া গোল পরপর। ৪৭ ও ৪৮ মিনিটের মাথায় টানা আক্রমণে ২টো গোল করেন দীপিকা। খেলার শুরুতে কিন্তু কিছুটা স্লো শুরু করেছিল ভারত। প্রথম কোয়ার্টারের ৬ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কর্নার পেয়েছিলেন দীপিকা। কিন্তু সেখান থেকে ফের ব্যর্থ হন তিনি গোল করতে। এরপর মণীশা ও নেহাও দুটো পেনাল্টি কর্নার পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেই কর্নার থেকেও গোল করতে পারেননি।

এই টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ১১টি গোল করে শীর্ষ গোলদাতার সম্মান লাভ করেছেন ভারতের দীপিকা। ফাইনালে তিনি একটি পেনাল্টি স্ট্রোক নষ্ট করেছেন বটে কিন্তু এগারোটির মধ্যে তিনি পাঁচটি গোলই করেছেন ফিল্ড গোল। এই ঐতিহাসিক শিরোপা জয়ের সঙ্গে, ভারত এখন দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মহিলা এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শিরোপা জেতে ভারত, এই জয়টি হকি এবং ভারতের বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার জন্য একটি বিশাল উৎসাহ হয়ে উঠেছে।

২০১৬ এবং ২০২৩-এর পর তৃতীয়বার এই খেতাব জিতল ভারতীয় টিম। এই জলের পরে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একই সারিতে উঠে এল ভারত। যুগ্ম ভাবে সর্বাধিক এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার রেকর্ড ভারতের মেয়েদের। টুর্নামেন্টে ৭টি ম্যাচের একটিতেও হারেনি তারা। কোচ হরেন্দ্র সিংহের অধীনে ঘরের মাটিতে এই জয় নিশ্চিত ভাবে এক স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলিস অলিম্পিক্সের জন্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে এই জয়। □

মঞ্চজুড়ে বাংলাদেশি হিন্দুদের আর্তনাদ

জিৎ সরকার

তোলপাড় বাংলাদেশ, হাসিনারে তাড়ায়ে দিসি। এলেন পরিত্রাতা উচ্চ শিক্ষিত ইউনুস। পরিবর্তন ...কেমন পরিবর্তন? ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা গোটা দেশে বিদ্যুৎ নাই। কুমড়ো আশি টাকা কেজি। সবজি আগুন। শিক্ষা সংস্কৃতি লাটে উঠসে। অ্যাজেন্ডা শুধু হিন্দু মারা। হিন্দুদের বাকি ভিটেটুকুও কেড়ে নাও ধর্মের জিগির দিয়া। ভারতের জিনিস বয়কট করো। অচ্যাচারে, চোরাপথে দুই লক্ষ আমাগো হিন্দু প্রাণের ভয়ে ভারতে পালিয়ে গেসে। বাকিরা সীমান্তে দাঁড়ায়ে কাঁদতাসে, বুক চাপড়ায়! হে ভারত! আমাগো হিন্দুগো বাঁচতে দাও। বাঁচাও মোদীজী, বাঁচাও মমতা দিদি। দূতাবাসের কর্মীরা সবাই আশ্চর্য ভাবে দর্শক। ঢাকা, ময়মসিংহ, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সাতক্ষীরা থেকে খুলনা, যশোর শুধু খুন খারাপি ধর্ষণ, লুঠ, অগ্নিসংযোগ... বাঁচাবে কে? অদ্ভুত এক আর্তনাদ মঞ্চজুড়ে।

২৫ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার তপন থিয়েটারে অভিনীত হলো প্রবীর মণ্ডলের বিতর্কিত নাটক 'করিম ভাই'-এর চতুর্থ শো। বাইরে এদিন জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়লেও প্রেক্ষাগৃহ ছিল উষ্ণ। শব্দে আগুন। 'করিম ভাই' এই নাটক বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট। একমাত্র হিন্দু বান্ধব, সংখ্যালঘু দরদি, করিম ভাই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ঘোড়া প্রতীকে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। তাঁর উদ্দেশ্য এমপি, চেয়ারম্যান হওয়া। তাঁর একমাত্র স্লোগান হিন্দুদের সুরক্ষা। কোনো হিন্দুকে যেন মুসলমানদের ভয়ে ভারতে আসতে না হয়, তা নিশ্চিত করা। তাঁর নির্বাচনী অ্যাজেন্ডার সবটাই হিন্দুদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য যেমন প্রচুর সরকারি সুযোগ সুবিধা, করিমভাই বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য সংখ্যালঘু নিজস্ব মন্ত্রক দাবি করে। সংখ্যালঘুদের তথা মুসলমান উন্নয়ন ভারতের লক্ষ্য। তাহলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা কেন ভারতের মতো বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার কথা ভাববে না? সবাই যদি সরকারের পোষ্য ভৃত্য হয়ে যায়!

সরকারের তেল মারে। তাহলে সরকার/শাসকের গলদগুলো চিহ্নিত করবে কে/কারা? করিম ভাই নাটক সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। নাট্যকারের মতে, মুসলমানদের থেকে আমাদের এটাই শেখার ওরা সরকারের গোলামি করে না। সরকার ওদের গোলামি করে। কী করে নিজেদের স্বার্থ আদায় করতে হয় ওরা জানে। আমরা হিন্দুরা তার বিপরীত, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমষ্টিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিই। যেখানে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ৩০ শতাংশ হিন্দু ছিল, এখন আট শতাংশের কম। বাকি ২২ শতাংশ হিন্দু কোথায় গেল? বিএনপি সাংসদ রুমিন ফারহানা 'হিন্দুদের সংখ্যা কমছে কেন?' এ নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসব তথ্য এই করিম ভাই নাটকে উঠে আসে। কোরান অবমাননার নাম করে নিরীহ হিন্দুদের মারধর, হত্যা, জেলে পোরা যেন জল ভাত। এই বার্তা নাটকে বার বার উঠে এসেছে। আর ইউনুস সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সব মাত্রা ছাড়িয়েছে মোল্লাবাদীরা। কোথায় যাবে এই সংখ্যালঘু হিন্দু। রাষ্ট্রবাদী ভারত সরকারই-বা এতো চুপচাপ কেন? এ এক হিন্দুপ্রেমী করিম ভাইয়ের প্রশ্ন।

এই নাটকের বিষয় দুর্দান্ত হলেও কয়েকটি বিষয় পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পর্যাপ্ত আলোকসম্পাত ছিল না বাবলু সরকারের। সংগীতের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করা দরকার রানা ও প্রবীর বাবুর। তবে এ নাটকের সম্পদ অবশ্যই অভিনেতা নির্দেশক প্রবীর মণ্ডল স্বয়ং। এই সময়ে এই গল্প বলার মতো ক্ষমতাকে ধন্যবাদ জানাই। তপন থিয়েটারে এই শোয়ে যে কারণেই হোক ভয়ে ভাবনায় দর্শক সংখ্যা খুব কম ছিল। তবে এই অর্ধেক দর্শক পূর্ণ তৃপ্ত হৃদয়ে নাটক দেখছেন এটা নিশ্চিত। □

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন তিনি। স্কুলের শিক্ষা শেষ হবার আগেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয়। তারপর তিনি তাঁর স্বামীর সহায়তায় সম্পূর্ণ শিক্ষার অধিকারিণী হন। তারপরেই শুরু হয়ে যায় মেয়েদের উত্থানের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, অশেষ লড়াই। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন করা প্রথম মহিলা— সরলা রায়।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর জন্ম সরলা রায়ের। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবক দুর্গামোহন দাশের কন্যা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ ড. প্রসন্ন কুমার রায়ের সহধর্মিণী। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সহধর্মিণী লেডি অবলা বসু তাঁর বোন।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে সখি-সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর সরলা দেবী উৎসাহের সঙ্গে তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সখি-সমিতি তৈরি করা হয়েছিল মেয়েদের উত্থানের জন্য। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সরলা দেবী বঙ্গের প্রথম মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়ান উইমেন্স এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন'। উপযুক্ত শিক্ষিকা তৈরি করে তাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা এটির লক্ষ্য ছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন 'বেথুন উইমেন্স এডুকেশন লিগ'। তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 'দ্য এল ইন্ডিয়া উইমেন্স এডুকেশন কলফারেন্সে'-এর ষষ্ঠ অধিবেশনে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন।

বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করার পাশাপাশি নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মৃত্যুর পর তিনি বাল্ক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা সেক্রেটারি হন। তাঁর প্রচেষ্টায় এই বালিকা বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের শিরোপা লাভ করে। শিক্ষাদানের যোগ্যতা মহিলাদেরও যে আছে তা সরলা দেবীই প্রথম জনসনক্ষে প্রমাণ করেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন কীভাবে শুধুমাত্র নারীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সরলা দেবী প্রতিষ্ঠা করেন 'গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর এই অসামান্য কীর্তি। আমি এই স্কুলের একজন ছাত্রী হতে পেরে গর্বিত। আমি আমার এই বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষিকা, ছাত্রী এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকলের পক্ষ থেকে তাঁর ১৬৩তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

জাতীয় উদ্যান

নামেরি

অসম রাজ্যের শোণিতপুর জেলার হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নামেরি জাতীয় উদ্যান। এটি অরুণাচল প্রদেশের পাখুই অভয়ারণ্যের সঙ্গে যুক্ত। দুটি মিলিয়ে প্রায় একহাজার কিলোমিটার বিস্তৃত এই উদ্যান। নামেরি জাতীয় উদ্যানে হাতি, গণ্ডার, বেঙ্গল টাইগার, ভারতীয় চিতাবাঘ, মেঘবর্ণ হরিণ, মার্বেল বিড়াল, চিতা বিড়াল, হগ হরিণ, সম্বর হরিণ, ঢোল, গৌড়, বার্কি ডিয়ার, বুনো শুয়োর, শ্লথ, হিমালয়াম কৃষ্ণ হরিণ এবং বহু প্রজাতির পাখি ও সরীসৃপ রয়েছে। এই উদ্যানের প্রাকৃতিক নীল দৃশ্য পর্যটকদের সারা বছর ধরে আকৃষ্ট করে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৪৬

ई-कारान्ते स्त्रीलिङ्गे

एकवचनम्-वहुवचनम्

जननी-जनन्यः (একজন মা। অনেকজন মা।)

देवी-देव्यः(একজন দেবী। অনেক জন দেবী।)

अभ्यास कुर्मः--

लेखनी-लेखन्यः, नदी-नद्यः, दर्वी-दर्व्यः,घटी-घट्यः, सखी-सख्यः, नगरी-नगर्यः, तन्त्री-तन्त्र्यः, द्रोणी-द्रोण्यः, गोणी-गोण्यः, कूपी-कूप्यः।

प्रयोग कुर्मः

नटी, घटी, सुन्दरी, भगिनी, नारी, स्त्री, रमणी, कुमारी, वल्लरी, वेल्लनी,
युवती, पूनःपुरणी, चलवाणी, दूरवाणी।

ভালো কথা

খেজুররস

আমাদের পুকুড়পাড়ে অনেকগুলি খেজুরগাছ আছে। এই শীতের সময় সবগুলি গাছেই রস লাগানো হয়। অনেক রস হয়। যারা রস লাগায় তারাই সব নিয়ে গুড় তৈরি করে। তবে সপ্তাহে একদিন সকালে আমাদের একহাড়ি রস দেয়। আমি, বাবা, দাদা গাছতলাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই। বাকিটা মায়ের জন্য নিয়ে যাই। সকালবেলা মিষ্টি ঠাণ্ডা রস খেতে খুব মজা। খাওয়ার পর সারা শরীর হিম হয়ে যায়। সেদিন খাওয়ার সময় আমাদের পাড়ারই একটি বাচ্চা ছেলে লোভনীয় দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখছিল। আমি খাওয়ার পর ওকেও দিলাম। ওর চোখে মুখে যে আনন্দ দেখলাম তাতে আমার মন ভরে গেল। আমি ওকে বললাম, রোববার করে আসবি।

সোনালি মহান্তি, বরাবাজার, সপ্তম শ্রেণী, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) য়া ব হা ও	(১) ফ উ ল ল চ্চ ন শী
(২) হ ৎ জ ই	(২) ধি রী প চ্চ দা কা উ

২৫ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অনাথবন্ধু (২) অভিনন্দন

২৫ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অতিজাগরণ (২) অজ্ঞাতপরিচয়

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, ই বি, মালদা। (২) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা।
(৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (৪) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ভারতীয় সংবিধানের মূলে কুঠারাঘাতকারী ওয়াকফ আইনের সংশোধন আশু কর্তব্য

মজার কথা— তুরস্ক, লেবানন, লিবিয়া, মিশর, জর্ডন, টিউনিশিয়া, ইরাক— এইসব ইসলামি দেশে ওয়াকফের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভারতে তা বহালতবিয়তে রয়েছে।

দেবজিৎ সরকার

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা সঞ্চয়কে একত্রিত করে শহরতলিতে একটুকরো জমি কিনলেন। জমি কেনার সময় আপনার উকিলবাবু সার্চিং করে দেখেছেন যে সরকারি নথি বলছে বিগত ১০০ বছর জমিটির বিক্রেতা সংশ্লিষ্ট জমিটির বৈধ মালিক। দলিল, পরচা, পিঠ দলিল সবকিছু জমা রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি আপনি ছোট্ট বাড়ি বানালেন। হঠাৎ একদিন নোটিশ এল যে আপনি বাড়িটি ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর বানিয়েছেন এবং আপনাকে সম্পত্তিটি বিনা বাক্যব্যয়ে ছেড়ে দিতে হবে। আপনি নোটিশ পেয়ে আপনার জেলার সিভিল জজের কাছে মামলা করতে গেলে আপনি জানতে পারলেন যে আপনার মামলাটি শুনানির ক্ষমতা সিভিল জজ (Jr. Devicion), সিভিল জজ (Sr. Devecion), জেলা জজের আপনার মামলাটি শোনবার ক্ষমতা নেই। আপনার মামলার নিষ্পত্তি করতে পারে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল অর্থাৎ যার গোরু ধান খেয়েছে, আপনাকে তার কাছেই বিচার চাইতে যেতে হবে।

ওয়াকফ আইন-১৯৯৫ এমনই একটি অদ্ভুত আইন যা কিনা দেশে অমুসলমান জনসাধারণের কাছে একটি সর্বগ্রাসী আইন। এবং মুসলমান ভোটব্যাংক তোষণের রাজনীতিকে সামনে রেখে ওয়াকফ আইনের নিরন্তর অসাংবিধানিক শক্তিবৃদ্ধি কংগ্রেসি রাজনীতির ফসল যা ভারতবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত জমির কাছে বর্তমানে একটি হুমকিতে পরিণত হয়েছে। এই আইনের বলে ভারতের যে কোনো অমুসলমান সম্পত্তি সরকারি বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে কোনো প্রকৃতির হোক না কেন তার নির্দিষ্ট নথিপত্র থাকলেও যে কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তিতে পরিণত হতে পারে।

সম্প্রতি ব্যাঙ্গালুরুর এক ময়দানে স্থানীয় হিন্দু জনতা ওই ময়দানে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গণেশ চতুর্থী উৎসব উদ্‌যাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি পেলেও কর্ণাটক ওয়াকফ বোর্ড জমিটিকে ১৮৫০ সাল থেকে তাদের মালিকানাভুক্ত বলে দাবি করে এবং হিন্দুদের উৎসবটি বন্ধ করার আদেশ জারি করে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গেলে সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে 'বৃহৎ ব্যাঙ্গালুরু মহানগর (বিবিএমপি)' দাবি করে যে সংশ্লিষ্ট ময়দানটি একটি সরকারি সম্পত্তি।

কিন্তু যেহেতু ওয়াকফ বোর্ড দাবি করেছে ১৮৫০ সাল থেকে ওই ময়দানটি ওয়াকফ সম্পত্তি। অতএব আদালত এই বিষয়ে কোনো আদেশ দিতে পারে না এবং সুপ্রিম কোর্ট এই দাবি মেনেও নেয়, অর্থাৎ ভারতীয় ওয়াকফ আইন অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ডের যে কোনো দাবির বলে যে কোনো সম্পত্তির উপর ওয়াকফ বোর্ডের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফাতা মহম্মদ ইশাক এবং অন্যরা বনাম রসময় ধর চৌধুরী মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের দুই জজ— জাস্টিস ফটেন হাম এবং জাস্টিস ট্র্যাভেলিয়ান ব্যক্তিগত ওয়াকফ সম্পত্তিকে অবৈধ বলে রায় দান করেন। এই সময় থেকে ১৯১৩ সালের সময় সীমার মধ্যে ভারতে ওয়াকফ বিলোপের জন্য মামলা হয়েছিল এবং ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলে এই মামলা গড়ায়। সেখানে সেই মামলার শুনানিতে চারজন ব্রিটিশ বিচারক ওয়াকফকে 'সবচেয়ে খারাপ এবং সবচেয়ে ক্ষতিকারক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে বর্ণনা করেন।'

[...a perpetuity of the worst and the most pernicious kind.]

ভারতবর্ষের সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই চারজন ব্রিটিশ বিচারকের সিদ্ধান্তকে পাশে সরিয়ে রেখে ১৯১৩ সালের মুসলিম ওয়াকফ বৈধকরণ আইন ভারতবর্ষের বুকে ওয়াকফকে স্বতন্ত্র স্থান দেয় এবং ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াকফ অ্যাক্টও। তারপরে দেশ স্বাধীন হলে মুসলমান ভোট-ব্যাংকের দিকে লক্ষ্য রেখে নেহরু সরকার ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড এবং বিভিন্ন রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড তৈরি করে।

এই সময় দেখা যায়, ভারতের বৃহত্তর ভূমি রাজস্বের মালিক হয় ওয়াকফ বোর্ড। ১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর দিল্লিতে কংগ্রেস সরকার থাকাকালীন ওয়াকফ আইনকে একটি অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়। যার

ফঃ ৬

বলে স্বাধীনতার আগে থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থিত যে কোনো স্থাবর সম্পত্তিকে ওয়াকফ বোর্ড যদি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করে, তাহলে সেই সম্পত্তিটি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকলেও দাবি করার মুহূর্ত থেকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। যেহেতু ওয়াকফ আইন অনুযায়ী যে কোনো সম্পত্তি আল্লাহর কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং তা আর ফেরত যোগ্য হয় না। তাই

১. ওয়াকফ একটি স্থায়ী ব্যবস্থা, তাই দেশের কোনো আইন বলে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে না।

২. কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ ঘোষণা করা মাত্রই সেটি তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে কার্যকরী হবে। দেশের কোনো আদালত এমনকী ওয়াকফ বোর্ড নিজেও কোনো স্থগিতাদেশ দিতে পারবে না।

৩. ওয়াকফ আইন অনুযায়ী কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ ঘোষণা করা একটি অপ্রত্যাহার যোগ্য আইনিচুক্তি অর্থাৎ Once waqf, waqf forever।

৪. ভারতের ওয়াকফ আইন অনুযায়ী ভারত সরকার বা কোনো রাজ্য সরকার কোনো কারণেই ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না।

এইরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের ও রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডগুলি ভারতবর্ষের সমস্ত সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। পন্থনিরপেক্ষ দেশে ওয়াকফের প্রাসঙ্গিকতা এই ধরনের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে থাকতে পারে না। একমাত্র মুসলমান ছাড়া ওয়াকফ সম্পত্তি ভারতবর্ষের কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো সুবিধা প্রদান করে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুধুমাত্র ভোটব্যাংকের দিকে তাকিয়ে তৈরি ওয়াকফ আইনটি ধারা ১৪ এবং ১৮ ধারা-সহ সংবিধানের পন্থনিরপেক্ষতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সারা ভারতে যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের হাতে থাকা জমিগুলিকে দখল করে চলেছে। তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের ভেট দ্বারকা, কর্ণাটক পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতে সর্বত্র ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করা হয়েছে। কলকাতার গল্ফক্লাব, টলি ক্লাব-সহ বিভিন্ন জায়গাকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করা হয়েছে।

মজার কথা হলো যে তুরস্ক, লেবানন, লিবিয়া, মিশর, জর্ডন, টিউনিশিয়া, ইরাক— এইসব ইসলামি দেশে ওয়াকফের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভারতে তা বহালতবিয়তে হয়েছে। বর্তমান ওয়াকফ আইন অনুযায়ী কোনো অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সিভিল কোর্টেরও এক্তিয়ার নেই।

দুটি উদাহরণ দিলে ওয়াকফ আইন অনুসলমানদের জন্য কতটা ভয়াবহ তা বোঝা যাবে—

১. ধরা যাক, একটি ওয়াকফ হাউজিং কমপ্লেক্সে ১০০টি ফ্ল্যাট আছে, যার একটি ফ্ল্যাটের মালিক মুসলমান। কোনো সুন্দর সকালে মুসলমান ভদ্রলোকটি তার ফ্ল্যাটটিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করলে সেই মূহূর্ত থেকে পুরো কমপ্লেক্স ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। এলাকার পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি দূরে থাক স্বয়ং কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার এবং ভারতবর্ষের কোনো দেওয়ানি আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। চান বা না চান, বাকি ৯৯ জন ফ্ল্যাট মালিকের চোখের সামনে ওয়াকফ বলে অর্পিত ওই ফ্ল্যাটটি একটি আলাদা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

২. আপনি গ্রামে আপনারই একটি জমি চাষ করেন। আপনার পাশের জমির মুসলমান মালিকটি আচমকা আপনার জমিটিকে একটি ওয়াকফ জমি বা কবরস্থান এবং নিজেকে আপনার জমিটির ওপর তৈরি হওয়া মুতোয়ালি অর্থাৎ তত্ত্বধায়ক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করতে পারলেও আপনার জমিটি ফিরে পাবার সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ। তার কারণ দেশের বর্তমান ওয়াকফ আইন অনুযায়ী কোনো সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি 'Once Waqf, Waqf forerver'।

৩. ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে শহর কলকাতায় কোনো একটি কমার্শিয়াল বিল্ডিঙে আপনার নিজের সংস্থার অফিস বানিয়েছেন। হঠাৎ একদিন ওয়াকফ বোর্ডের নোটিশ পেলেন যে আপনার অফিসটি খালি করতে হবে, কারণ আপনার অফিসের পুরো বিল্ডিংটি ওয়াকফ সম্পত্তি। যতই দলিল দস্তাবেজ, ট্যাক্স রসিদ থাকুক না কেন, আপনাকে ওই সম্পত্তিটি ছেড়ে দিতে হবে।

উপরের উদাহরণগুলি কোনোটিই কষ্টকল্পনা নয়, Opindia নামক একটি সংস্থা ভারতবর্ষে এইরকম ২৭টি ঘটনাকে সামনে এনেছে।

মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচার হওয়া ১৯৪৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৩৩৫টি মামলার রায়কে বিবেচনা করলে প্রায় এই জিনিসই দেখা যাবে যে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের নামে মাঝে মাঝে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি আদালতগুলির সামনে এসেছে। অন্যদিকে, এই আইনকে সামনে রেখে অমুসলমানদের সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পত্তি গ্রাসের যে প্রবণতা দশকের পর দশক ধরে ভারতবর্ষের মানুষ সহ্য করে চলেছে তার আশু অবসান হওয়া প্রয়োজন। তোষণকারী এই আইনটি সংবিধানের ধারা ১৪-কে সরাসরি আঘাত করছে।

সংবিধানের মূলে কুঠারাঘাতকারী এই চালু ওয়াকফ আইনটির বিভিন্ন ধারাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক ও উদার সভ্য ব্যবস্থার উপযোগী করে তোলার জন্য ভারত সরকারের আনা ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-কে সমর্থন করা এবং সংসদের ভিতরে ও বাইরে এর সপক্ষে জনমত তৈরি করা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয়দের একটি অবশ্যকর্তব্য।

(লেখক আইনজীবী)

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ওয়াকফ বোর্ড – ভারতের মধ্যে আর একটি পাকিস্তান তৈরির কংগ্রেসি ষড়যন্ত্র

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা উঠেছিল। ঘটনাটা এরকম, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভেতরে একটি পুরনো মসজিদ ছিল। সেখানে মুসলমান উকিলরা নমাজ পড়তেন। একদিন হঠাৎ সকালে দেখা গেল সেই স্থানটিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। বাকি উকিলরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামলেন। বললেন, এ কেমন কথা! এলাহাবাদ হাইকোর্টের জমি কবে থেকে ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে গেল? মুসলমান উকিলরা চোখ রাঙাতে শুরু করল। মামলা হলো এলাহাবাদ হাইকোর্টে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলে, তোমাদের মসজিদটি এখান থেকে সরিয়ে নাও। বোর্ড বলে এটি ওয়াকফ সম্পত্তি, তার উপরে এই মসজিদ, একে সরানো যাবে না। এই সম্পত্তি মুঘলরা আমাদের দিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্ট সব শুনে বলে সম্মানের সঙ্গে মসজিদটি হটিয়ে নাও নয়তো একে ভেঙে ফেলা হবে।

'ওয়াকফ অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল-২০২৪' নিয়ে সারা দেশে বিতর্ক চলছে। ভারতে মুসলমান ভোটব্যাংকের এমনই মধু দেশে যে কোনো সমস্যা আসুক না কেন, কে মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো ত্রাণকর্তা তা প্রমাণ করতে তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলির লাইন লেগে যায়। তাই ওয়াকফ বোর্ড আইনের সংশোধনে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে বিল আনতেই প্রতিপক্ষ দলগুলি 'ইসলাম খতরে মে হ্যায়' বলে চিৎকার জুড়েছে। প্রত্যেকেই বলছে মুসলমানদের ত্রাণকর্তা হিসেবে মোদীর বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরাই আগমার্কা খাঁটি।

স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সংবিধানকে ঢাল করে জিন্নার অপূর্ণ স্বপ্নকে অর্থাৎ ভারতকে ধীরে ধীরে একটি ইসলামি দেশ বানানোর কাজে লেগেছিল। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ১৯৫৪ সালে এদেশে প্রথম সংসদে ওয়াকফ আইন পাশ করেন। তারপর ১৯৬৪ সালে সেই আইন সংশোধন হলো। ১৯৯৫ সালে প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাও আইন সংশোধন করে তাদের হাতে তুলে দেয় অসীম ক্ষমতা। আবার ২০১৩ সালে এই আইনের শেষ সংশোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। অর্থাৎ এদেশে ওয়াকফ বোর্ড তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে সেই আইন সংশোধন করা পর্যন্ত সবই হয়েছে কংগ্রেসি আমলে।

কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ জানেই না কেন ওয়াকফ আইন তৈরি করা হয়েছিল? এমনকী আমাদের দেশের কোনো আইন কলেজেও তা পড়ানো হয় না। এই আইনকে হিন্দুদের থেকে এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কারণ এতে এমন কিছু সেকশন আছে যা পড়লে সকলে চমকে উঠবে। খুব কম লোকেই জানেন পাকিস্তানের আয়তন কত? পাকিস্তানের মোট আয়তন ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার একর। আর ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে আজ ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি। অর্থাৎ ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ভারতের মধ্যেই আরেকটি পাকিস্তান হয়ে বসে আছে।

খুব কম লোকেই জানেন পাকিস্তানের আয়তন কত? পাকিস্তানের মোট আয়তন ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার একর। আর ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে আজ ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি। অর্থাৎ ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ভারতের মধ্যেই আরেকটি পাকিস্তান হয়ে বসে আছে।

১৯৯১ সালে নরসিমহা রাও সরকার সেকুলারিজমের নামে 'প্লেসেস অব ওরশিপ অ্যাক্ট' তৈরি করেন। বলা হলো ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদেশের সব ধর্মস্থানে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। মন্দির-মসজিদ বিবাদ আর তোলা যাবে না। অর্থাৎ ইসলামি আক্রমণকারীরা যেসব মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে তা আর কোনোদিন হিন্দুরা দাবি করতে পারবে না। ঠিক তার চার বছরের মাথায় ১৯৯৫ সালে ওই নরসিমহা রাও সরকারই 'ওয়াকফ সংশোধনী বিল' এনে বোর্ডের হাতে তুলে দেয় জমি দখলের ব্রহ্মাস্ত্র। এর ফলে তারা চাইলে যে কারও সম্পত্তি, ব্যক্তিগত বা মঠ-মন্দির-গুরুদ্বারারই হোক না কেন, তা তারা নিজেদের বলে ঘোষণা করতে পারবে। একদিকে 'প্লেসেস অব ওরশিপ অ্যাক্ট-১৯৯১'-এর মাধ্যমে হিন্দুদের হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন মন্দিরগুলি ফিরে পাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো, অন্যদিকে ওয়াকফ সংশোধনী ১৯৯৫-এর মাধ্যমে এদেশের যে কোনো সম্পত্তিকে কবজা করার অধিকার দেওয়া হলো।

ধরুন, আপনার জমি যদি কোনোদিন ওয়াকফ বোর্ড তাদের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে, তবে আপনি তার বিরুদ্ধে ভারতের কোনো কোর্টে যেতে পারবেন না। ওয়াকফ আইনের সেকশন ৪০ অনুযায়ী আপনাকে যেতে হবে ওয়াকফের ট্রাইব্যুনালে। সেখানে তাদের নিজেদের জজ, নিজেদের উকিল,

নিজেদের বিচারপদ্ধতি আছে। তাদের কাছে আছে মুঘল আমলের ফ্যামিলি ট্রি। তারা সেটা খুলে বলবে বাবর, আকবর, ঔরঙ্গজেব এদেশের মালিক ছিল, তাই এ জমি আইনত তোমার নয়, ইসলামের সম্পত্তি। ট্রাইব্যুনাল তাদের, জজ তাদের, উকিল তাদের, তাই বিচারও তাদের। এভাবেই ওয়াকফ বোর্ড আজ ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমির মালিক। বোর্ড চাইলে এদেশের যে কোনো ব্যক্তির, যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, যে কোনো সংগঠনের জমি সহজে কেড়ে নিতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ সামনে রাখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এবছর অক্টোবর মাসে তামিলনাড়ুর একটি পুরো গ্রামকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করা হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্রামে ১৫০০ বছরের প্রাচীন একটি মন্দিরও আছে। ঘটনাটি তখন সামনে আসে যখন গ্রামের এক দরিদ্র চাষি তার মেয়ের বিয়ের জন্য নিজের জমি বিক্রি করতে গেলে রেজিস্ট্রি অফিসে তাকে জানায় ওয়াকফ বোর্ড থেকে এনওসি আনতে হবে, তবেই সে জমি বিক্রি করতে পারবে। কারণ তার জমি এখন ওয়াকফ সম্পত্তি। চাষি তো অবাক! যে জমি তার বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষ ভোগ করেছে, যে জমির ন্যায়সঙ্গত কাগজ তার আছে, সে জমি কীভাবে ওয়াকফের হয়? আসলে ওয়াকফ বোর্ড সেই গ্রামের সমস্ত জমি ওয়াকফ প্রপর্টি হিসেবে কাগজ তৈরি করে রেজিস্ট্রি অফিসে জমা করে দিয়েছে। আইন অনুসারে যার জমি কেড়ে নিচ্ছে তাকে জানাবার কোনো দরকার নেই। এক বছরের মধ্যে চাষি যদি এর বিরুদ্ধে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে অবজেকশন না দেয়, তবে আইনত জমিটি ওয়াকফের হয়ে যাবে। রেজিস্ট্রেশন অফিসে প্রতিদিন হাজার হাজার কাগজ জমা পড়ে। ওয়াকফ রেজিস্ট্রি অফিসে তাদের দাবির কাগজপত্র জমা করে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। একথা চাষির জানা ছিল না, তাই এক বছরের মধ্যে কোনো অ্যাপিলও করেনি। সুতরাং সারা গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তার জমিটিও ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষিত হয়ে গেছে।

ইসলামের বয়স কত? ১৪০০ বছর। আর ভারতে ইসলাম এসেছে মাত্র হাজার বছর আগে। এদেশে ওয়াকফ বোর্ড যদি তৈরি হয় মাত্র ৭০ বছর আগে, তবে গ্রামের দেড়হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির কী করে ওয়াকফ সম্পত্তি হয়? ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে একইভাবে মনমোহন সিংহ সরকার দিল্লির ১৩৩টি সরকারি সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়ে সেগুলিকে ওয়াকফ সম্পত্তি মেনে নিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন, যে দেশে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে বিপুল সম্পত্তি সেই দেশে হজ করতে যাওয়া মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুর করের টাকায় সাবসিডি দেবে কেন?

পরের ঘটনা ২০০৫ সালের। ওয়াকফ বোর্ড তাজমহলকে তাদের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (ASI) এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এখনও মামলা লড়ছে। সুপ্রিম কোর্ট বোর্ডের কাছে জানতে চেয়েছে শাজাহান কবে একে ওয়াকফ প্রপর্টি বলে ডিড করেছিলেন? তাজমহল যদি আজ ওয়াকফ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়, তবে কাল তো এরা লালকেল্লা, ফতেপুর সিক্রি-সহ দেশের প্রাচীন স্থাপত্যগুলিকে নিজেদের বলে দাবি করে ফেলবে। ঠিক যেমন করে গত ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লির চারটি মন্দিরকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি জানানো হয়েছে।

২০২১ সালে গুজরাটের সুরাট নগর নিগমের হেড অফিসকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শাজাহানের শাসনকালে ওই সম্পত্তি নাকি ওয়াকফ প্রপর্টি বলে দান করা হয়েছিল। একবার কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ বলে ঘোষণা করা হয়ে গেলে তাকে আর পরিবর্তন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই বোর্ড হলো শরিয়া আদালত। আমি হিন্দু, আমি এই দেশের নাগরিক, আমার জমির বিবাদ কেন আমার দেশের আদালত বিচার করতে পারবে না? কেন শরিয়া আদালত তার বিচার করবে?

আসলে কংগ্রেস এদেশে মুসলমানদের জন্য সমান্তরাল শরিয়তি আইনি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। মথুরার জ্ঞানবাপী-কৃষ্ণজন্মভূমির ক্ষেত্রেও ওয়াকফ বোর্ড এই যুক্তি দেখিয়েছে যে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট এর বিচার করতে পারবে না, কারণ জ্ঞানবাপী হলো ওয়াকফ সম্পত্তি। তাই ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালেই এর বিচার করতে হবে। কংগ্রেস এইভাবে সিভিল কোর্টের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমানদের জন্য একই দেশে স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা গড়ে দিয়েছে।

সৌদি আরব ইসলামি দেশ। সে দেশে ওয়াকফ আইন নেই। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এই আইন স্বীকৃত নয়। আজকে ২০২৪-এ যখন মোদী সরকার এই ওয়াকফ বোর্ডের চতুর্থ সংশোধন করার চেষ্টা করছে, বিরোধীরা তখন একযোগে এর বিরোধিতায় নেমেছে। বলছে মোদী মুসলমান বিরোধী, এই আইন সংশোধনের মাধ্যমে মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায়।

এখন প্রশ্ন, যে দেশে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে বিপুল সম্পত্তি সেই দেশে হজ করতে যাওয়া মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুর করের টাকায় সাবসিডি দেবে কেন? কেন মাদ্রাসা বোর্ডকে সরকার অনুদান দেবে? ওয়াকফ বোর্ডের হাতে এত সম্পত্তি কিন্তু তারা দেশে একটিও স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায় না। তবে এত প্রপর্টি কোন কাজে লাগছে? অনেকে বলছেন ওয়াকফ বোর্ড এখন জমি মাফিয়া হিসেবে কাজ করছে।

ঠিক এজন্যই দেশে ওয়াকফ বোর্ড তুলে দেওয়া উচিত। ওয়াকফ বোর্ড আসলে এই দেশে শরিয়ত আইন চালু করার প্রথম ধাপ। সরকারের উচিত শীঘ্রই এই চক্রান্ত সমাপ্ত করে সারাদেশে ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করা। □

অবশেষে খোলসা হলো ইউনুস পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মূল রহস্য

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সখ্য ও সমুদ্রনীতির লঙ্ঘন এই অঞ্চলের শান্তি বিনষ্টের কারণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চাঞ্চল্যকর ১০ ট্রাক অস্ত্র আটকের ঘটনার ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এবার আস্ত এক জাহাজ এসে গত ১১ নভেম্বর ভিড়লো চট্টগ্রাম বন্দরে। এবার লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যে মহাগৌরবে। আনুমানিক ২,৩০০ TEUs ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩৭০টি কন্টেইনার। সেইবার দশ ট্রাকে ছিল ৪৬৩টি বাক্স, যেগুলিতে এমটিটি, এসএমজি, টমিগান ৭৯০টি, গ্রেনেড ২৭ হাজার, রকেট লঞ্চার ১৫০, ম্যাগজিন ৬২০ এবং ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫২০টি গুলি। যার আনুমানিক মূল্য ছিল ২৭ হাজার কোটি টাকা। এবার আস্ত একটি জাহাজে কী পরিমাণ থাকতে পারে ভাবতেও অবাক লাগবে সবার কাছে। তখন বিএনপি সরকার ছিল ক্ষমতায়। ওই ঘটনার পর তৎকালীন সরকার এই অস্ত্র চালানের দায়ও দৃষ্টি ঘুরিয়ে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির ওপর চাপালেও ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হয়ে আসে এর সঙ্গে তৎকালীন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সংযোগের বিষয়টি। এই অস্ত্রশস্ত্রের চোরাচালান জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর দিয়ে কর্ণফুলী নদীতে আনা হয়েছিল। সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ এই চোরাচালানের বিষয়ে অবহিত বা জড়িত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। ২০০৫ সালের ৬ জুলাই এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ২০১৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আদালত এই মামলার রায় প্রকাশ করে। আদালত সাবেক শিল্পমন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামির আমির মতিউর রহমান নিজামি, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর-সহ ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। গত ৫ আগস্ট আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর উপদেষ্টারা তড়িঘড়ি করে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এর পেছনে সুদূরপ্রসারী এক ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। হাসিনা সরকারের পতনের পেছনে দেশের জনগণকে ভুল বুঝিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক একটি গোষ্ঠীর ভূমিকা এখন আর কারও না বুঝার নয়। একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে সংগঠিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সরকারকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল সেটিও আজ পরিষ্কার। এই কুচক্রী মহল ক্ষমতায় এসেই ভারতের প্রতি অকারণে আঙুল তুলেছিল। অবশ্য একটা গোষ্ঠী বরাবরই প্রতিদিন ভারতের বিরুদ্ধে কিছু না বলে ভাত খান না। এটা তাদের মজ্জাগত স্বভাব ও নৈমিত্তিক বদভ্যাসজনিত রোগ। এতদিন চট্টগ্রাম ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি জাহাজ চলাচলের জন্য কোনো নির্দিষ্ট রুট ছিল না বলে জাহাজটি দুবাই-করাচি-চট্টগ্রাম রুটে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায়। গত ১২ নভেম্বর সমস্ত মাল খালাস করে সেটি বন্দর ত্যাগ করে। খালাসকালীন সময় বন্দরের নিয়মনীতিকে উপেক্ষা ও তোয়াক্কা না করে নিয়মবহির্ভূত উপায়ে তড়িঘড়ি করে খালাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই সময়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের দুই কর্মকর্তা বিধিবিধানের কথা বলায় তাদেরকে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম পাকিস্তান তার জাহাজ বাংলাদেশে নোঙ্গর করছে। এখন সেদেশের মুখে মুখে একটাই প্রশ্ন দেশটির মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কী কারণে এত অস্ত্রের মজুদ করা হলো? প্রশ্নটি এখন দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। কেউ কেউ বলতে চাইছেন সেগুলি ভারতের বিরুদ্ধে কিংবা সে দেশের হিন্দুনিধনের কাজে ব্যবহার করা হবে। তবে আতঙ্ক ও উদ্বেগের বিষয় হলো সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র থাকার সম্ভাবনাটিও উড়িয়ে দিতে চাইছে না অনেকে। যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে বিষয়টি বিস্তারিত খতিয়ে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক তদন্ত হওয়া দরকার। এদিকে বাংলাদেশে পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ সরাসরি শিপিং রুটটিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলে আরও সমন্বিত ও বাণিজ্য নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড়ো পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগটি কেবল দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য প্রবাহকে ত্বরান্বিত করবে না বরং উভয় পক্ষের ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগের প্রসার করবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। আর গোলাবারুদ আমদানি ও রপ্তানিতে কঠিন নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এই কাজে অনেকগুলি ধাপ থাকে। টেন্ডার ও এলসি-সহ অনেক কাজ সম্পন্ন করতে কমপক্ষে আঠারো মাস অনেক সময় তা দুই বছরও লেগে যায়। কিন্তু এই আমদানিতে কোনো পক্ষই নিয়মের তোয়াক্কা করেনি। নিজেদের মর্জিমাফিক প্রশাসনকে ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে নিয়েছে উপদেষ্টা সরকার। দেশের নানা জটিলতার মধ্যেও গোলাবারুদ আমদানিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সে দেশের সরকার কী বোঝাতে চেয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে সেটি বড়ো প্রশ্ন। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে মানুষের প্রাণ কেড়েছে, মা-বোনদের ইজ্জত কেড়েছে, সম্পদ ধ্বংস করেছে তাদের সঙ্গে গলায় গলায় খাতির দেখে সবাই অবাক। তদুপরি সম্প্রতি বাংলাদেশ নৌবাহিনী পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক নৌ মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ যৌথ মহড়ায় অংশ নেবে পাকিস্তানিদের সঙ্গে। গত মাসে এই উদ্দেশ্যে একটি বাংলাদেশি ফ্রিগেট পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। আরও অবাক করার বিষয় হলো, বাংলাদেশ কাস্টমস ও অটোমেশন শাখার দ্বিতীয় সচিব গত ২৯.০৯.২০২৪ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপনে (নং ০৮.০১.০০০০.০৯১.৩৩.০০৩.২৪.১৫৪) স্বাক্ষর করে জানিয়েছেন পাকিস্তান হতে যত জাহাজ আসবে সেগুলিতে সরকারের সকল নিয়মনীতি মুক্ত রাখা হয়েছে। এই বিষয়গুলি অবশ্যই ভারতকে উদ্বিগ্ন করতে পারে, কারণ এটি বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশ-পাকিস্তানের আকস্মিক এই সখ্য ও সমুদ্রনীতির লঙ্ঘন এই অঞ্চলের শান্তি বিনষ্টের কারণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। করাচি থেকে আনা গোলা-বারুদ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের হাতে বইয়ের বদলে, এবার তুলে দেওয়া হবে মারণাস্ত্র। পরিকল্পনা পরিষ্কার— কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দুদের উপর নেমে আসবে আরও ভয়াবহ আক্রমণ। দুই-তিনটি পক্ষের সংঘর্ষে গোট জাতিকে রক্তাক্ত করে ধ্বংসের কিনারায় ঠেলে দেবে এই ষড়যন্ত্র। ছাত্রদের ব্রেন ওয়াশ করে তাদের বানানো হচ্ছে ঘাতক বাহিনী, আর অস্ত্র দিয়ে সাজানো হচ্ছে এক সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ।

অবশেষে খোলসা হলো ইউনুস সরকারের দ্বারা মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড ষড়যন্ত্রের মূল রহস্য।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বদলে যাচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতির চেহারা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত সরকারের আর্থিক নীতির প্রশংসা করলেন গ্লোবাল ইনভেস্টর তথা অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ জিম রজারস। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ভারতের অর্থনীতির চেহারাটাই পালটে দিয়েছে। সংবাদসংস্থা আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দিল্লির তরফে আর্থিক সংস্কারের কথা বলা হলেও, সেই সব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের অভাব ছিল। তিনি আরও বলেন,'দীর্ঘ বেশ কয়েক দশক ধরে আগের কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ভালো ভালো কথা বলেছে, কিন্তু সেগুলি কার্যকর হয়নি। আমার কখনও মনে হয়নি যে দিল্লি আদতে অর্থনীতিটা বোঝে। এখন প্রথমবার আমার মনে হয়েছে, দিল্লি অর্থনীতিটা বুঝতে পারছে এবং তা আরও উন্নত

করার চেষ্টা করছে।'

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা উল্লেখ করে রজার আশা প্রকাশ করেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নততর হবে। এমনকী নতুন করে বিনিয়োগের ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন— 'আগামীদিনে ভারতে আরও বেশি বিনিয়োগ করব। কারণ ভারতে এক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।'

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে, তারও প্রশংসা করেন রজার। বিশ্বে সবথেকে দ্রুতগতিতে উন্নতির নজির গড়েছে ভারতীয় অর্থনীতি। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির পরিমাণ ৮.২ শতাংশ। সম্প্রতি মোতিলাল অসোয়াল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড সংস্থার একটি রিপোর্টে আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক পরিবর্তন। সেখানে বলা হয়েছে, গত এক দশকে ভারতে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৮ ট্রিলিয়ন ডলার। আর ১৯৪৭ থেকে ভারতে মোট বিনিয়োগের অঙ্ক ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার।

কলকাতায় ধৃত বিএনপির সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জাল নথিতে বারবার জড়িয়েছে কলকাতার নাম। এরই মাঝে বাংলাদেশে চলছে ব্যাপক অরাজকতা। বেছে বেছে হিন্দুদের টার্গেট করা চলছে। আর সেই অস্থিরতার সুযোগে বেড়ে চলেছে অনুপ্রবেশ। সীমান্ত থেকে ধরা পড়ছে একের পর এক অনুপ্রবেশকারী। এবার খাস কলকাতায় ধরা পড়েছে এক বাংলাদেশি। এলেবেলে কেউ নয়, সে হলো বিএনপির সদস্য। প্রায় দু'বছর ধরে ভারতে রয়েছে সে। তার নাম সেলিম মহম্মদ ওরফে সেলিম মাতব্বর। সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল রবি শর্মা নামে। গত ২৯ নভেম্বর রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের একটি গেস্টহাউজ থেকে ওই অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের মাদারিপুরের বাসিন্দা। ভারতে ঢুকে নাম ভাঁড়িয়ে, জাল নথি তৈরি করে কলকাতার একটি হোটেলে বাস করছিল। জাল পাসপোর্ট ও আধার কার্ড সে কীভাবে তৈরি করল, ভারতে আসার পিছনে তার কী উদ্দেশ্য, তার সঙ্গে আরও কেউ ভারতে এসেছিল কিনা— সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

জাল নথি তৈরির অভিযোগে বারবার নাম জড়াচ্ছে কলকাতার। গত ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে কর্ণাটকের চিত্রদুর্গে ৬ জন গ্রেপ্তার হয়। পাসপোর্ট ও জাল নথি উদ্ধার হয় ধৃতদের কাছ থেকে। জানা যায়, সেই জাল পাসপোর্ট ও নথি তৈরি হয়েছিল কলকাতা থেকেই। পার্কস্ট্রিটে ধৃত বাংলাদেশির কাছেও উদ্ধার হলো জাল নথি। কসবার গুলশন কলোনি অনুপ্রবেশকারীদের ঘাঁটি হিসেবে কুখ্যাত। এবার অনুপ্রবেশকারীর আস্তানা রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের হোটেল। খাস কলকাতা শুধু নয়, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া সীমান্ত থেকে দুই দালাল-সহ তেরো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে শুধু নদীয়া থেকেই জালে ধরা পড়েছে ১০ অনুপ্রবেশকারী। মুর্শিদাবাদের রানিনগর থেকে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সাইদুল শেখের বাড়ি পাবনার গোপালপুরে। সাইদুলের সঙ্গে ধরা পড়ে দুই দালাল ফিজুল ও আমিরুল শেখ। নদীয়া সীমান্তের ধরমপুর খালপাড়া থেকে চার অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা না থাকা সত্ত্বেও গত ২৮ নভেম্বর এক মহিলা-সহ চারজন ভারতে ঢোকে। দু'দিন এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা।

বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ করলেন কলকাতার নামি চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর লাগাতার নির্যাতন এবং হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় ফুঁসছে ভারত-সহ গোটা বিশ্ব। সেদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একাধিক উপদেষ্টার মুখ থেকে শোনা গিয়েছে ভারত-বিরোধী মন্তব্য। এমনকী বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বুয়েট) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে পেতে রাখা হয়েছে ভারতের পতাকা। আর এরপরেই বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতার খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন এই বিশিষ্ট চিকিৎসক। সঙ্গে শহরের অন্য চিকিৎসকদেরও এই পথে হাঁটার আবেদন জানিয়েছেন ইন্দ্রনীলবাবু।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢাকার বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে ভারতের জাতীয় পতাকা পেতে রাখার ছবি পোস্ট করে ডাঃ ইন্দ্রনীল সাহা লিখেছেন— 'বুয়েট ইউনিভার্সিটির প্রবেশপথে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা! চেম্বারে বাংলাদেশের রোগী দেখা আপাতত বন্ধ রাখছি। আগে দেশ, পরে রোজগার। আশা রাখবো সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া অবধি অন্য চিকিৎসকরাও তাই করবেন।' অপ্রতুল চিকিৎসা পরিকাঠামো, আকাশছোঁয়া চিকিৎসার খরচ এবং সেদেশে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব থাকায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসেন। জটিল রোগে আক্রান্ত বহু বাংলাদেশিকে চিকিৎসা করাতে নিয়মিত কলকাতায় আসতে হয়। কার্যত কলকাতার চিকিৎসকদের ভরসায় বেঁচে রয়েছেন তারা। তবে সেদেশে যেভাবে ভারত-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে ইন্দ্রনীল সাহাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থন করেছেন অনেকেই। তাদের দাবি, জেহাদিদের দমন না করলে একতরফা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার দায় নেই ভারতেরও।

আদালতে উঠল আজমেঢ় শরিফ মামলা, নোটিশ গেল কেন্দ্রের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিব মন্দিরের জায়গায় তৈরি হয়েছে আজমেঢ় শরিফ দরগা। এমনটাই দাবি জানিয়েছে দু'টি জাতীয়তাবাদী সংগঠন। তাদের বক্তব্য, সমীক্ষা করলেই এই তথ্য বেরিয়ে আসবে। গত ২৭ নভেম্বর সেই মামলা আজমেঢ় আদালত গ্রহণ করেছে। মামলা গ্রহণ করেই কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক এবং আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-কে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত।

তাজমহল, জ্ঞানবাপী, সম্ভালের জামা মসজিদের পর রাজস্থানের আজমেঢ় শরিফ, খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাও হিন্দু মন্দির বলে দাবি উঠল। হিন্দু সেনা এবং মহারাণা প্রতাপ সেনা নামক দু'টি হিন্দু সংগঠন দাবি করেছে— আজমেঢ় শরিফ দরগা আসলে হিন্দুদের শিবমন্দির ভেঙে তৈরি করা হয়েছে। এই সংগঠনগুলির দাবির প্রেক্ষিতে কেন্দ্র এবং এএসআইকে নোটিশ পাঠিয়েছে আজমেঢ় আদালত।

জানা যায়, মুঘল বাদশা আকবরের আমল থেকে এই দরগায় ইসলামি মজহবের লোকজন আসেন। ২০২২ থেকে এই দরগাকে শিবমন্দির বলে দাবি করে আসছে হিন্দু সংগঠনগুলি। মহারাণা প্রতাপ সেনা নামের সংগঠনটি বছর দুই আগে আজমেঢ় শরিফে সমীক্ষার দাবি করে একে হিন্দু মন্দির বলে দাবি জানায়। রাজস্থান সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দাবি জানিয়েছে। স্বস্তিক চিহ্ন রয়েছে সেখানে বলে দাবি। সংগঠনের দাবি, এটি প্রথমে শিব মন্দির ছিল যেটিকে পরবর্তীকালে দরগায় পরিণত করা হয়। আজমেঢ় আদালত ওই হিন্দু সংগঠনগুলির আবেদন গ্রহণ করে, এই সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক এবং এএসআইকে নোটিশ পাঠিয়েছে। আগামী ২০ ডিসেম্বর এই মামলার শুনানি, তার আগে কেন্দ্র এবং এএসআইকে তাদের মতামত জানাতে হবে। উত্তরপ্রদেশে জ্ঞানবাপী সৌধ নিয়েও একইভাবে আইনি লড়াই চলছে। মন্দিরের অজস্র নিদর্শন মিলেছে সেখানে। সেগুলিকে সম্বল করে সরব হয়েছে হিন্দুরা। এবার বিতর্ক শুরু আজমেঢ় দরগা নিয়ে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ হোক

ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে অন্যায় কারাবাস থেকে মুক্ত করা হোক

৩০ নভেম্বর, ২০২৪।। বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর ইসলামি কট্টরপন্থীদের দ্বারা আক্রমণ, হত্যা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ ও মহিলাদের উপর অমানবিক অত্যাচার অত্যন্ত চিন্তাজনক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য এজেন্সি এসব বন্ধ করার পরিবর্তে মূকদর্শক হয়ে রয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে বাংলাদেশের হিন্দুরা নিজেদের রক্ষার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে প্রতিবাদ সংগঠিত করছে, তাকে দমনের জন্য তাদেরই উপর পুনরায় অন্যায় অত্যাচারের এক নতুন পর্যায় দেখা যাচ্ছে।

এমনই শান্তিপূর্ণ প্রদর্শনের মাধ্যমে হিন্দুদের নেতৃত্বদানকারী ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে বাংলাদেশ সরকারের তরফে কারারুদ্ধ করা অন্যায় কাজ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে, তারা যেন বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করে এবং প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে কারাবাস থেকে অতি শীঘ্র মুক্ত করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারত সরকারের কাছেও অনুরোধ করছে যে, ভারত সরকার বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে অব্যাহত রাখুক এবং তার সমর্থনে বিশ্ব জনমত গড়তে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারত তথা বিশ্বের সমস্ত দেশ ও সংস্থার বাংলাদেশের নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করা প্রয়োজন এবং নিজ নিজ সরকারের প্রতি তাদের পক্ষে এই বিষয়ে যথাসম্ভব প্রচেষ্টার দাবি উপস্থাপন বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্বরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

দত্তাত্রেয় হোসবলে
সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের তরফে ওয়াকফ বোর্ড ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৩০ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড গঠনের বিষয়ে তাদের পূর্ববর্তী নির্দেশ প্রত্যাহার করে নতুন একটি আদেশ জারি করেছে। এই সরকারি আদেশে বলা হয়েছে যে বোর্ডের চেয়ারপার্সন নির্বাচনের ওপর আদালতের স্থগিতাদেশের পর দীর্ঘ সময় ধরে বোর্ডের কার্যকলাপ না চলার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াকফ বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) এই বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে এনেছিলেন এবং তারপর মামলার ফয়সালা এবং প্রশাসনিক সংকট রোধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে এই আদেশে বলা হয়েছে।

২০২৩ সালের ২১ অক্টোবর শাইক খাজা, মুতাওয়াল্লি, বিধায়ক হাফিজ খান এবং এমএলসি রুহুল্লাহ অন্ধ্রপ্রদেশ ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়, এবং অন্য আটজনকে ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। শাইক খাজার নির্বাচন এবং ওয়াকফ বোর্ড গঠনের জন্য জারি করা গভর্নমেন্ট অর্ডার (জি.ও.-৪৭)-এর বৈধতা একাধিক রিট পিটিশনের মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। সরকারি আদেশনামাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া আবেদনগুলি বিবেচনা করে ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর হাইকোর্ট চেয়ারপার্সনের নির্বাচন স্থগিত করে। আদালত বলে যে ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য নির্বাচন নির্ভর করছে এই মামলার চূড়ান্ত ফলাফলের উপর। পিটিশনগুলি বিচারাধীন থাকার দরুন ওয়াকফ বোর্ড এতদিন ছিল চেয়ারপার্সনহীন। এই পরিস্থিতিতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের তরফে তাদের আগের জি.ও. প্রত্যাহার করার আদেশ জারি হওয়ার ফলে রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড ভেঙে গেল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় এবং ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন সংসদে প্রণীত হলে সেই আইন অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ড পুনর্গঠিত হতে পারে বলে সংবাদসূত্রের খবর।